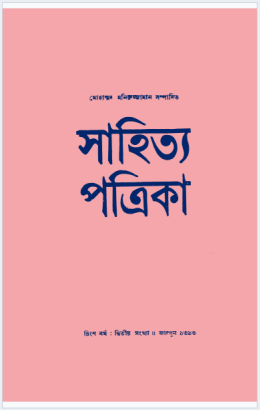

Vol. 30 | No. 2 | 1987

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

সোমেন চন্দ : গল্পগুচ্ছ

Volume	30
Issue	2
Year	1987
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	বিশ্বজিৎ ঘোষ
Published online	February 1, 1987
DOI	10.62328/sp.v30i2.6
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v30i2.6
Pages	129-171
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

সোমেন চন্দ : পত্রগুচ্ছ

বিশ্বজিৎ ঘোষ

ভূমিকা

বাংলা কথাসাহিত্যের ধারায়, স্বল্প-সংখ্যক সৃষ্টি নিয়ে কম-পরিচিত এবং প্রায়-বিস্মৃত হলেও, সোমেন চন্দ একটি ব্যতিক্রমী এবং উজ্জ্বল নাম। চব্বিশটি গল্প, একটি অসম্পূর্ণ উপন্যাস, দুটি নাটিকা এবং একটি কবিতা—হাতে গোণা এই ক'টি সাহিত্যকর্মই আজ সোমেন চন্দের সৃষ্টিসত্তার পরিচয়বাহী। তিনি লিখেছিলেন আরো বেশ কিছু গল্প-কবিতা-উপন্যাস, কিন্তু অসতর্কতা, পত্রিকা-পত্রালির দুষ্প্রাপ্তি আর কাল-গ্রাসের হাত থেকে সে-সব লেখা আজো উদ্ধার করা যায়নি। আলোচ্য নিবন্ধে আমরা উপস্থাপন করবো সোমেন চন্দের সাতটি পত্র, যেখানে আছে তাঁর মানসসত্তা, সমাজভাবনা, সাহিত্যচিন্তা এবং স্রষ্টাচৈতন্যের মৌল-চারিত্রনির্দেশক উপাদানপুঞ্জ।

এক. জীবন-কথা

১৯২০ খ্রীস্টাব্দের ২৪শে মে (১০ই জ্যৈষ্ঠ ১৩২৭ বঙ্গাব্দ) সোমবার সোমেন চন্দ[১] জন্মগ্রহণ করেন। সোমেন চন্দের মূল নাম সোমেন্দ্রকুমার চন্দ। তাঁর পিতার নাম নরেন্দ্রকুমার চন্দ। নরেন্দ্রকুমারের নিবাস ছিল ঢাকা জেলার নরসিংদি মহকুমার (বর্তমানে জেলা) অন্তর্গত ঘোড়াশালের নিকটবর্তী বালিয়া গ্রামে। তিনি ঢাকা জেলার কেরানিগঞ্জ উপজেলার অন্তর্গত ধিতপুর গ্রামে বিবাহ করেন, কিন্তু যাকে বিবাহ করেন তার নাম বা বংশ-পরিচয় এখনো অজ্ঞাত।[২] সোমেন চন্দের বয়স যখন মাত্র চার বছর, তখন তাঁর জননী অকালে মারা যান। প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর পর ১৯২৪ সালে নরেন্দ্রকুমার পুনরায় বিয়ে করেন। তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রীর নাম সরযূ, যিনি টঙ্গীর নিকটবর্তী ধউর গ্রামের ডাক্তার শরৎচন্দ্র বিশ্বাসের কন্যা। সরযূকেই সোমেন প্রকৃত অর্থে মা বলে জানতেন। সরযূ চন্দের

গর্ভে তিন সন্তান জন্ম নেয়---প্রথমে কন্যা নন্দিতা, পরে পুত্র কল্যাণ, এবং সবশেষে কন্যা নিবেদিতা, যারা সকলেই এখন ভারতনিবাসী।

সোমেন চন্দের প্রপিতামহের নাম শিবপ্রসাদ চন্দ। তার জনৈক পুত্রের (নাম অজ্ঞাত) তিন সন্তান ছিল। এরা যথাক্রমে কন্যা ধীরু, পুত্র রাজেন্দ্র এবং কনিষ্ঠ পুত্র নরেন্দ্র। পরিবারটি দীর্ঘদিন যাবৎ বংশানুক্রমিক ভাবে বালিয়ায় ভূমিকেন্দ্রিক জীবনযাপন করেছে। কিন্তু নরেন্দ্রকুমারের বড় ভাই রাজেন্দ্রকুমার ঢাকা শহরের জিমখানা ক্লাবে চাকরি নেন, হয়ে-ওঠেন চাকরিজীবী শহুরে মানুষ। বিভিন্ন কারণে দুই ভাইয়ের মধ্যে ভালো সম্পর্ক ছিল না। তাই এক সময় দু-ভাই পৃথক হয়ে যান, নরেন্দ্রকুমার স্বতন্ত্র বাসায় বসবাস শুরু করেন।

সোমেনের পিতা নরেন্দ্রকুমার ছিলেন ভাবুক প্রকৃতির মানুষ, তাই সংসারের দিকে তিনি নজর দিতেন না তেমন। যৌবনে তিনি স্বদেশ-প্রেমের মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে সচেতনভাবে স্বদেশী আন্দোলনের প্রতি ঝুঁকে পড়েছিলেন। নরেন্দ্রকুমার ঢাকার মিটফোর্ড মেডিকেল স্কুল ও হাসপা-তালের স্টোর্স বিভাগে স্বল্প-বেতনের চাকরি করতেন। যা বেতন পেতেন, তাতে সংসার চালাতে তাকে খুব কষ্ট করতে হতো; তবু নরেন্দ্রকুমার সর্বদাই ছিলেন প্রাণোচ্ছল আর হাসি-খুশিতে ভরপুর।

সোমেন চন্দের শৈশব-বাল্য-কৈশোরজীবন কেটেছে ঢাকা শহরে। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে ১৯৩২ সালে তিনি সদরঘাটের নিকটবর্তী পোগোজ স্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হন। এই স্কুল থেকেই ১৯৩৬ সালে তিনি দ্বিতীয় বিভাগে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় প্রথম বিভাগের জন্য মোট নম্বর থেকে সোমেন মাত্র ১১ নম্বর কম পেয়েছিলেন। তখন প্রথম বিভাগ না পেলে মেডিকেল স্কুলে ভর্তি হওয়া প্রায় অসম্ভব ব্যাপার ছিল। কিন্তু যেহেতু সোমেনের বাবা মিটফোর্ড হাসপাতালের কর্মচারি, তাই কলেজের সুপারিনটেনডেন্ট বিশেষ ক্ষমতা-বলে সোমেনের ভর্তি হবার অনুমতি এবং বিনা বেতনে পড়ালেখার সুযোগ করে দেন। সরযূর কিছু স্বর্ণালঙ্কার বিক্রি করে সোমেনের ডাক্তারি পড়ার বই কেনা হয়। কিন্তু আর্থিক সঙ্কট এবং প্লুরিসিস বা ব্রঙ্কাইটিস রোগে আক্রান্ত হবার ফলে সোমেনের ডাক্তারি পড়া আর হলো না। এ-পর্যন্তই সোমেনের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা।

ছেলেবেলায় সোমেন ছিলেন দুরন্ত, জেদী আর ভীষণ অভিমানী। কমলালেবুর মতো উজ্জ্বল বর্ণ আর প্রশস্ত ললাটধারী সোমেন চন্দ ছোটবেলা থেকেই ছিলেন স্বল্পভাষী। ১৯৩৫ থেকে ১৯৩৭ সালের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত সোমেনদের পরিবার ঢাকার ঠাঁটারীবাজার এলাকায় একটা ভাড়া-করা বাড়িতে থাকতেন। এর পূর্বে তাঁরা থাকতেন সম্ভবত তাঁতিবাজারে। ১৯৩৭ সালের কথা, সোমেনের বয়স তখন মাত্র ১৭ বছর। সোমেনরা এ-সময় ঠাঁটারীবাজারের বাসা ছেড়ে দক্ষিণ মৈশুণ্ডিতে ৪৭ নম্বর লালমোহন সাহা স্ট্রীটের ভাড়া-বাড়িতে চলে যান। এ-সময় থেকেই সোমেন চন্দের জীবনে আসে নতুন মাত্রা।

১৯৩৪ সালে আন্দামান জেলে-সংগঠিত কমিউনিস্ট কনসোলিডেশন-এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ঢাকার কমিউনিস্টরা সতীশ পাকড়াশীর নেতৃত্বে কমিউনিস্ট পার্টি সংগঠনে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৩৮ সালের শেষ দিকে কমিউনিস্টরা দক্ষিণ মৈশুণ্ডির জোড়পুর লেনে একটা অফিস স্থাপন করেন। 'কমিউনিস্ট পাঠচক্র' নামে গোপন ক্লাসের মাধ্যমে এখানে শ্রমিকশ্রেণী এবং যুবসমাজকে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বৈজ্ঞানিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা হতো। সোমেন এখানে আসেন আকস্মিক ভাবেই, কিন্তু ক্রমে সতীশ পাকড়াশীর শ্রমে-প্রযত্নে তিনি এ-সংগঠনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত হন। ঐ পাঠচক্রের প্রকাশ্য শাখার নাম ছিল 'প্রগতি পাঠাগার'। সোমেন চন্দের আগ্রহ এবং কর্মদক্ষতার পরিচয় পেয়ে কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দ সোমেন চন্দের ওপর 'প্রগতি পাঠাগার' পরিচালনার ভার দেন। এ-সংগঠনে আসার ফলে কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা বেড়ে যায় এবং ক্রমে তিনি কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হবার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেন। পাঠাগার পরিচালনায় সাফল্য, তাত্ত্বিক জ্ঞান, শ্রমিক-কৃষকের জন্য সহমর্মিতা, গণসাহিত্য রচনায় আগ্রহ---সোমেনের এ-সব বৈশিষ্ট্যের জন্য ঢাকা জেলা কমিউনিস্ট পার্টির নেতারা এ-সময় তাঁকে পার্টি সংগঠনে নিয়ে আসার কথা চিন্তা করেন। কিন্তু যেহেতু সোমেনের স্বাস্থ্য ছিল দুর্বল, তাই তাঁকে সরাসরি পার্টিতে নিয়ে আসতে তাঁরা কিছুটা ইতস্তত করছিলেন। তবে ১৯৪১ সালের মাঝামাঝি সময় সোমেন চন্দ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ লাভ করেন।[৩] ঢাকা জেলায় কমিউনিস্ট

আন্দোলন সংগঠনে বিপ্লবী এই তরুণের অবদান পরবর্তী কালে অনেক কমিউনিস্ট সংগঠক উল্লেখ করেছেন তাঁদের স্মৃতিকথায়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন সময়ে কমিউনিস্ট পার্টি যখন নিষিদ্ধ, তখন কমিউনিস্ট পার্টির কর্মধারা সচল রাখতে সোমেন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এ-সময় কমিউনিস্ট পার্টির শক্তিশালী গণ-সংগঠন ঢাকা রেলওয়ে শ্রমিক ইউনিয়ন পরিচালনার মতো কোন সংগঠক ছিল না। কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃবৃন্দ মাত্র বিশ-বছর বয়সী সোমেনের ওপর ভার দেন এই কঠিন দায়িত্ব পালনের। রেলওয়ে শ্রমিক ইউনিয়ন পরিচালনা, বিভিন্ন শাখা-সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা, গোপন সভা, শ্রমিকশ্রেণীকে রাজনৈতিকভাবে শিক্ষিত করা—প্রভৃতি কাজ সোমেন দক্ষতার সঙ্গে পালন করতেন। রেলওয়ে শ্রমিকদের মধ্যে কাজ করে সোমেন চন্দ অতি অল্প সময়ে বিপুল জনপ্রিয়তা ও সাফল্য অর্জন করেন, তাই কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃবৃন্দ তাঁকে এই সংগঠনের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করতে বলেন। পার্টির ডাকে তিনি সাড়া দেন এবং ১৯৪১ সালের মাঝামাঝি সময়ে তিনি সর্বসম্মতিক্রমে ইস্ট বেঙ্গল রেলওয়ে শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ফ্যাসিস্ট আক্রমণের হাত থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে পৃথিবীর দেশে দেশে জনমত সংগ্রহের প্রচেষ্টা চলে। এ-উদ্দেশ্যেই ১৯৪১ সালের জুন মাসে কলকাতায় গঠিত হয় 'সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি'। ঢাকায় 'সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি' গঠিত হয় ১৯৪২ সালের জানুয়ারি মাসে। এ-সমিতি সংগঠনে সোমেনের ছিল উজ্জ্বল ভূমিকা। ঢাকার 'সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি'র উদ্যোগে ১৯৪২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সদরঘাটের নিকটবর্তী ব্যাপটিস্ট মিশন হলে সপ্তাহব্যাপী যে চিত্র-প্রদর্শনী হয়, তা আয়োজনেও সোমেন পালন করেন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।

রাজনৈতিক জীবনের পাশাপাশি প্রগতিশীল সাহিত্যিক ও সাহিত্য-কর্মী হিসেবে সোমেন চন্দের জীবন উজ্জ্বল কীর্তিতে ভাস্বর। যে-চেতনায় বিপ্লবের সময় তিনি ভ্যানগার্ডে থাকতে চেয়েছেন,[৪] সেই চেতনা-প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে তিনি বেছে নিয়েছিলেন সাহিত্য। প্রথম জীবনে তিনি লিখতেন রোম্যান্টিক প্রেমের গল্প। ক্রমশ রাজনীতির সঙ্গে সংলগ্ন হয়ে, তিনি আত্মনিয়োগ করেন গণমুখী সাহিত্য-রচনায়। ১৯৩৭ সালে

প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম রচনা 'শিশু তপন' গল্প, কলকাতার 'দেশ' পত্রিকায়। এরপর তিনি অনেক গল্প-কবিতা-নাটক লিখেছেন। তাঁর সাহিত্যিক-জীবনকে স্পষ্টতঃ দুটো পর্বে ভাগ কর যায়। ১৯৩৭ থেকে ১৯৩৯ পর্যন্ত প্রথম পর্ব; আর ১৯৩৯ থেকে মৃত্যু পর্যন্ত (৮ মার্চ ১৯৪২) দ্বিতীয় পর্ব। প্রথম পর্বে তিনি গ্রামীণ মানুষের জীবন-চিত্রণে ছিলেন অধিক আগ্রহী; এ-সময় তাঁর আদর্শ ছিলেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৮৪--১৯৫০)।[৫] দ্বিতীয় পর্বে তাঁর প্রধান অনুপ্রেরণা ছিলেন ম্যাক্সিম গোর্কি (১৮৬৮-১৯৩৬), র‍্যালফ ফক্স (১৯০০-১৯৩৭) এবং ক্রিস্টোফার কডওয়েল (১৯০৭-১৯৩৭) প্রমুখ।

সোমেনের সাহিত্যিক-জীবনের এই পর্বান্তর সূচিত হয় একটি বিশেষ ঐতিহাসিক ঘটনার অনুপ্রেরণায়। ১৯৩৫ সালে হিটলারের নেতৃত্বে যখন পৃথিবীর দেশে দেশে ফ্যাসীবাদী শক্তি মানব-সভ্যতাকে ধ্বংস করার জন্য উন্মত্ত হয়ে ওঠে, তখন পৃথিবীর অগ্রগণ্য শিল্পী-সাহিত্যিকগণ প্যারিসে সমবেত হয়ে ফ্যাসীবাদী শক্তির বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য মানবজাতিকে ডাক দেন। লন্ডনে ব্রিটিশ-ভারতীয় প্রগতিশীল লেখকদের উদ্যোগে গঠিত হয় 'প্রগতি সাহিত্য সংঘ'। এরই রেশ ধরে ১৯৩৫ সালের ১০ই এপ্রিল গঠিত হয় 'নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘ'। এই ঘটনার প্রেরণায় ১৯৩৯ সালে ঢাকার মানবতাবাদী-প্রগতিশীল লেখকদের উদ্যোগে গঠিত হয় 'প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘ'। রণেশ দাশগুপ্ত, অচ্যুত গোস্বামী, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, সত্যেন সেন, অমৃত-কুমার দত্ত, সরলানন্দ সেন, জ্যোতির্ময় সেন, সতীশ পাকড়াশী প্রমুখ শিল্পী-সাহিত্যিক-চিন্তাবিদের প্রচেষ্টায় 'প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘ' নামে এই যে প্রতিষ্ঠানটি গড়ে উঠল, বয়সে সকলের চেয়ে কনিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও সোমেন চন্দই তাতে গ্রহণ করেন প্রধান উদ্যোগীর ভূমিকা। ১৯৩৯ সালে প্রস্তুতি-পর্ব সমাপ্ত হলেও ১৯৪০ সালের মাঝামাঝি সময়ে গেণ্ডারিয়া হাই স্কুল প্রাঙ্গণে এক সম্মেলনের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে 'প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘ' গঠিত হয়। এই সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন কাজী আবদুল ওদুদ (১৮৯৪-১৯৭০)। সম্মেলনে রণেশ দাশ-গুপ্তকে সম্পাদক এবং সোমেন চন্দকে সহ-সম্পাদক নির্বাচিত করে একটি কমিটি গঠিত হয়। ঢাকায় প্রগতি সাহিত্য-আন্দোলন বিকাশে সোমেন চন্দ পালন করেন উজ্জ্বল ভূমিকা।[৬]

'প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘ' গঠিত হলে সোমেন চন্দের কাজের পরিধি বেড়ে যায়। প্রগতি পাঠাগার পরিচালনা, ঢাকা রেলওয়ে শ্রমিক ইউনিয়নে কাজ করা, প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘের দায়িত্ব পালন করা, রাত জেগে গল্প লেখা—সব কিছু মিলে সোমেন তখন অতিবাহিত করেন অত্যন্ত কর্মব্যস্ত জীবন। সাংগঠনিক কাজের সাথে সাথে তত্ত্বগত ভিত নির্মাণের জন্য এ-সময় তিনি ব্যাপক পড়ালেখাও শুরু করেন।

১৯৪০ সালের শেষ দিকে ঢাকায় প্রগতি লেখক সংঘের কর্মীরা 'ক্রান্তি' নামে একটি সাহিত্য-সংকলন বের করেন—এটিই পূর্ববাংলার প্রথম প্রগতিশীল সাহিত্য-সংকলন। সোমেন চন্দ ছিলেন এই সংকলনের প্রকাশক। ১৯৪০ সালের শেষদিকে শ'খানেক 'ক্রান্তি' নিয়ে সোমেন কলকাতা যান—উদ্দেশ্য কলকাতার সাহিত্যিকমহলে 'ক্রান্তি'-প্রচার। ঢাকা থেকে প্রকাশিত 'ক্রান্তি' দেখে কলকাতার প্রগতিশীল সাহিত্য-শিল্পী মহলে সৃষ্টি হয়েছিল যথেষ্ট আলোড়ন। 'ক্রান্তি' নিয়ে কলকাতা যাবার প্রায় বছর দুয়ের পূর্বে ১৯৩৯ সালের প্রথম দিকে সোমেন একবার কলকাতা যান—সেই তার প্রথম কল্লোলিত কলকাতা-সন্দর্শন। কলকাতায় গিয়েছিলেন তিনি 'বালিগঞ্জ' (১৯৩৯), 'অগ্রগতি' (১৯৩৮), 'সবুজ বালায় কথা' (১৯৩৮)—প্রভৃতি পত্রিকার সম্পাদক নির্মলকুমার ঘোষের আমন্ত্রণে, এবং কলকাতায় এসে তিনি উঠেছিলেন শ্রীঘোষের বাড়িতেই। বর্তমান নিবন্ধে সংকলিত চার-সংখ্যক পত্রে সোমেন উল্লেখ করেছেন প্রথম কলকাতা-ভ্রমণের প্রসঙ্গ।

১৯৪২ সালের ৮ই মার্চ (১৩৪৮ বঙ্গাব্দের ২৪শে ফাল্গুন) রবিবার সোমেন চন্দ ফ্যাসিস্ট বাহিনীর ভাড়াটিয়া গুণ্ডাদের হাতে শহীদ হন। ঐদিন ঢাকার সূত্রাপুরে আয়োজিত ফ্যাসীবিরোধী সম্মেলনে যোগ-দানের উদ্দেশ্যে সোমেন চন্দ যখন একটি মিছিল নিয়ে লক্ষ্মীবাজারের কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন উগ্র জাতীয়তাবাদী ফরোয়ার্ড ব্লক, আর. এস.পি.-র সমর্থকরা অতর্কিতে আক্রমণ চালিয়ে তাঁকে নির্মমভাবে হত্যা করে। যিনি ছিলেন ফ্যাসীবিরোধী আন্দোলনের পুরোভাগে, তিনি নিহত হলেন ফ্যাসিস্টদেরই হাতে। স্পেনে ফ্যাসিস্ট ফ্রাঙ্কোর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে গিয়ে কমিউনিস্ট-সাহিত্যিক র‍্যালফ ফক্স যেমন আন্দালুসিয়ার লোপেরা গ্রামের মাটি বুকের রক্তে রক্তিম করেছিল,

ক্রিস্টোফার কডওয়েল যেমন স্পেনের জারামা নদীর নীল জল বুকের রক্তে রাঙিয়ে দিয়েছিল কিংবা জন কর্নফোর্ড যেমন কর্ডোভার নিসর্গকে হৃদপিণ্ডের রক্তে লাল করে দিয়েছিল; তেমনি, তাঁদেরই চৈতন্যের সহোদর, বাংলাদেশের প্রথম সাহিত্যিক শহীদ, সোমেন চন্দ ফ্যাসিস্টবিরোধী আন্দোলন করতে গিয়ে ঢাকার রাজপথ বুকের রক্তে রক্তিম করেছে—স্পেনের রক্ত-স্রোতের সাথে ঢাকার রক্তস্রোতের ভ্রাতৃত্ব গড়ে ওঁদের মতোই বীরের মৃত্যু বরণ করেছে আর অনাগত উত্তরসুরির কাছে রেখে গেছে সংগ্রাম আর বিপ্লবের জন্যে অমরতার সমান একগুচ্ছ সূর্য-করোজ্জ্বল অনুপ্রেরণা-অনুপ্রাণনা।

সোমেনের হত্যাকাণ্ড ভারতবর্ষের প্রগতিশীল শিল্পী-সাহিত্যিকদের করে তোলে আলোড়িত-বিক্ষুব্ধ, বিভিন্ন অঞ্চলে তাঁর মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই অনুষ্ঠিত হতে থাকে প্রতিবাদ সভা। শিল্পী-সাহিত্যিকরা পত্রিকায় বিবৃতি পাঠিয়ে প্রকাশ করেন তাঁদের ক্ষোভ ও ঘৃণা। ১৯৪২ সালের ২৩শে মার্চ প্রগতিশীল শিল্পী-সাহিত্যিকরা পত্রিকায় এই হত্যার প্রতিবাদে একটি বিবৃতি দেন। বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেন----প্রমথ চৌধুরী, অতুল-চন্দ্র গুপ্ত, ইন্দিরা দেবী, আবু সয়ীদ আইয়ুব, প্রমথনাথ বিশী, সুবোধ ঘোষ, জ্যোতির্ময় ঘোষ, নীরেন্দ্রনাথ রায়, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, আবদুল কাদির, কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, হিরণকুমার সান্যাল, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সমর সেন, বিনয় ঘোষ, স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য, অরুণ মিত্র, অমিয় চক্রবর্তী, সরোজ দত্ত, বুদ্ধদেব বসু, অজিত দত্ত, বিষ্ণু দে প্রমুখ। সোমেন চন্দের মৃত্যুতে বাংলার প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীসমাজ কিভাবে প্রতিবাদমুখর হয়েছিল, তা আমরা 'ফ্যাসিস্টবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ' নামক সংগঠনটির গঠনের মধ্য দিয়ে বুঝতে পারি। ফ্যাসিস্টবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ গঠনের পশ্চাতে হিটলারের সোভিয়েত আক্রমণ এবং ভারতের ওপর জাপানের হামলা ছিল পরোক্ষ কারণ; কিন্তু তাৎক্ষণিক এবং প্রত্যক্ষ প্রেরণা ছিল সোমেন চন্দের হত্যাজনিত প্রতিবাদ-সম্ভব প্রতিক্রিয়া।[৭]

স্কুল-জীবন থেকেই সোমেন চন্দ গল্প-কবিতা লিখতেন। তাঁর লেখা ছাপা হতো—ঢাকার প্রভাতী (১৯৩৬), সোনার বাংলা (১৯৩৪), শান্তি (১৯৩৪), ক্রান্তি ((১৯৪১), সারথি (১৯৪০); সিলেটের বলাকা (১৯৩৭);

কলকাতার 'দেশ' (১৯৩৩), 'অরণি' (১৯৪১), 'জনযুদ্ধ' (১৯৪২), 'সবুজ বাংলার কথা' (১৯৩৮), 'অগ্রগতি' (১৯৩৮), 'নবশক্তি' (১৯৩৯), 'বালিগঞ্জ' (১৯৩৯), 'পরিচয়' (১৯৪২), 'আনন্দবাজার' (১৯৩৩) প্রভৃতি পত্রিকায়। জীবিত-কালে তাঁর কোন গ্রন্থ প্রকাশিত হয়নি। ১৯৪২ সালের ডিসেম্বর মাসে ঢাকার প্রতিরোধ পাবলিশার্স প্রকাশ করে তাঁর প্রথম গল্প-সংকলন "সঙ্কেত ও অন্যান্য গল্প"। এই গল্প-গ্রন্থে সংকলিত হয় ছটি গল্প---রাত্রিশেষ, স্বপ্ন, একটি রাত, সংকেত, দাংগা, এবং ইঁদুর। ১৯৪৩ সালের ডিসেম্বর মাসে কলকাতার মডার্ন পাবলিশার্স প্রকাশ করে সোমেন চন্দের দ্বিতীয় গল্প-গ্রন্থ 'বনস্পতি'। 'বনস্পতি'তে সংকলিত হয় এগারটি গল্প---মরুদ্যান, ভালো না-লাগার শেষ, অমিল, সত্যবতীর বিদায়, সিগারেট, গান, প্রত্যাবর্তন, অকল্পিত, মহাপ্রয়াণ, প্রান্তর, ও বনস্পতি। এই সতেরটি গল্প ছাড়াও এ-পর্যন্ত সোমেন চন্দের আরো সাতটি গল্প বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা থেকে সংগৃহীত হয়েছে। তাঁর এ-যাবৎ পাওয়া একমাত্র উপন্যাস (অসম্পূর্ণ) 'বন্যা' প্রকাশিত হয় নির্মলকুমার ঘোষ সম্পাদিত কলকাতার 'বালিগঞ্জ' পত্রিকায়। মাঘ ১৩৪৬ থেকে মাঘ ১৩৪৭---এই এক বছরে 'বালিগঞ্জ' পত্রিকার যে এগারটি সংখ্যা বের হয়, তাতে ধারাবাহিকভাবে 'বন্যা' ছাপা হয়। ঢাকার 'শান্তি' পত্রিকায় তাঁর দুটো একাংকিকা প্রকাশিত হয়---'বিপ্লব' ও 'প্রস্তাবনা'। সোমেন চন্দের অনেক রচনা এখনো উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

শত ব্যস্ততার মধ্যেও All India Radio ঢাকা কেন্দ্রের শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানে সোমেন চন্দ ছিলেন একজন প্রায়-নিয়মিত আলোচক। তিনি ছিলেন উদার, বন্ধু-বৎসল, নিরহঙ্কারী শান্ত-স্বভাবের মানুষ। পৃথিবীকে জানার স্পৃহা ছিল তাঁর অদম্য। তাই ১৯৩৮ সালের মধ্যে, সোমেনের বয়স যখন মাত্র আঠার, তিনি টি. এস. এলিয়ট, অডেন, স্টিফেন স্পেণ্ডার, ভার্জিনিয়া উল্‌ফ, হাক্‌সলী, ই. এম. ফর্স্টার, হেমিংওয়ে, ম্যাক্সিম গোর্কি, আঁদ্রে জিদ, র‍্যালফ ফক্‌স, ক্রিস্টোফার কডওয়েল, আপটন সিনক্লেয়ার প্রমুখ সাহিত্যিকের রচনা গভীর মনোযোগের সঙ্গে পাঠ করেছেন। তাঁর পড়ালেখার পরিধি ছিল বিস্তৃত এবং ব্যাপক। মার্কসের 'ডাস ক্যাপিটাল' যেমন তিনি পড়েছেন, তেমনি

আবার যোসেফ ম্যাজিনির *Duties of Man.* রমঁ্যা রলাঁ-র *I Will Not Rest,* র‍্যালফ্ ফক্সের *The Novel and the People* কিংবা ক্রিস্টোফার কডওয়েলের *Illusion and Reality* ছিল তাঁর অতি প্রিয় গ্রন্থ।

সোমেন চন্দ তাঁর বিস্ময়কর এবং কাললগ্ন প্রতিভা-গুণে প্রগতিশীল রাজনীতি আর সাহিত্যান্দোলনে স্বতন্ত্র এবং ব্যতিক্রমী সত্তা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁর সকল কর্মের পিছনেই একমাত্র স্বপ্ন ছিল শ্রমিক-কৃষক-সাধারণ মানুষের বিজয়-সংগ্রামকে ত্বরান্বিত করা; নিপীড়িত মানুষের আপসহীন সংগ্রামের শিল্পরূপ-সৃজনই তাঁর সাহিত্যিক-জীবনের মৌল-অন্বিষ্ট। সৃজনলগ্নের ভোরবেলা থেকেই তিনি গেয়েছেন মানুষের মুক্তির গান, স্বাধীনতার গান, শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার কোরাস। এই আপসহীন বিপ্লবীর রক্ত মিশেছে পৃথিবীর দেশে দেশে মুক্তিযোদ্ধাদের রক্তের সাথে। বাংলাদেশের প্রথম সাহিত্যিক শহীদ এই বীর কমিউনিস্ট-লেখক প্রতিটি আগামীর যুদ্ধে এক মহান মুক্তিযোদ্ধার সাহস-সঙ্কল্প আর অন্তহীন প্রেরণা নিয়ে থাকবেন আমাদের সাথে, জনতার মাঝে।

দুই. পত্র-প্রসঙ্গ

বর্তমান নিবন্ধে সোমেন চন্দের মোট সাতটি পত্র সংকলিত হয়েছে। প্রথম চারটি পত্র নির্মলকুমার ঘোষের উদ্দেশ্যে লিখিত, পঞ্চম পত্রটি অচ্যুতকুমার গোস্বামীর উদ্দেশ্যে আর ষষ্ঠ-সপ্তম পত্রদ্বয় অমৃতকুমার দত্তের উদ্দেশ্যে লিখিত। সংকলিত পত্রগুচ্ছ সোমেন-মানস অনুধাবনের জন্য অপরিহার্য উপাদান। তাঁর সাহিত্যভাবনা, সমাজচিন্তা এবং শিল্পদৃষ্টির মৌল-বৈশিষ্ট্যসমূহ পত্রগুচ্ছে অভিব্যক্ত হয়েছে।

সোমেন চন্দ বিশ্বাস করতেন, সাহিত্যের মৌল-উদ্দেশ্য হচ্ছে সমাজ বিকাশের জন্য মানুষের চৈতন্যকে জাগ্রত করা, তাকে শ্রেণীসচেতন করে তোলা। মানুষের মধ্যে বিপ্লবের অনুভূতি সঞ্চার করে যে-সাহিত্য, সোমেনের বিশ্বাস-মতে, তা-ই প্রকৃত সাহিত্য। সংকলিত প্রথম পত্রটিতে তাঁর এই বিশ্বাস উচ্চারিত হয়েছে। তিনি বলেছেন, "···বিপ্লবের

অনুভূতি আমার সাহিত্যসাধনার সর্বাঙ্গে যেন জড়িয়ে থাকে।" পত্রটিতে লেখা-লেখি সংক্রান্ত তাঁর কিছু ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা জানা যায়। 'মুখোস' এবং 'দুই পরিচ্ছেদ' নামে তিনি দুটি গল্প লিখে-ছিলেন, সে-সংবাদ এখানে আছে, কিন্তু গল্পদ্বয় আজো উদ্ধার করা যায়নি। এখানে তাঁর শিল্পবোধের অনেক প্রান্ত উন্মোচিত হয়েছে। তাঁর ব্যাপক পড়ালেখারও কিছু ইঙ্গিত প্রথম পত্রটিতে পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় পত্রটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এখানে সোমেনের একমাত্র উপন্যাস 'বন্যা'র প্লট বর্ণিত হয়েছে এবং উপন্যাসটি সম্পর্কে সোমেন কি ভাবছেন, সে-কথাও। ১৯৩৮ সালের নভেম্বর মাসে লেখা এই পত্রটিতে সোমেন ডিসেম্বরের শেষ দিকে তাঁর প্রথম কলকাতা-যাবার পরিকল্পনা ব্যক্ত করেছেন। সোমেন এখানে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্য সম্পর্কে কিছু কথা বলেছেন, যা তাঁকে সমালোচক হিসেবে চিনে নিতে সাহায্য করে। প্রথম পত্রের মতো, এখানেও আছে লেখালেখি সম্পর্কে তাঁর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা।

তৃতীয় পত্রটিতে সোমেনের রাজনৈতিক চিন্তার ছায়াপাত আছে। গণতন্ত্র নয়, বরং সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন তিনি, তা এখানে পরোক্ষে অভিব্যক্ত হয়েছে। এখানেও আছে তাঁর ব্যাপক অধ্যয়নের সংবাদ। চতুর্থ পত্রটিতে অচেনা-শহর কলকাতায় সোমেনের প্রথম যাত্রার পরি-কল্পনা প্রকাশিত হয়েছে।

অচ্যুতকুমার গোস্বামীর কাছে লেখা পত্রটিতে সোমেনের বন্ধু-প্রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। 'ঢাকা প্রগতি লেখক সংঘ'-প্রকাশিত 'ক্রান্তি' সংকলন বের করতে সোমেন যে-প্রচুর পরিশ্রম করেছেন, তার ইঙ্গিত এখানে আছে।

অমৃতকুমার দত্তের কাছে লেখা পত্রদ্বয়ে সোমেনের সাহিত্যচিন্তা এবং সমাজভাবনার কথা যেমন আছে, তেমনি আছে অন্তরঙ্গ বন্ধুত্বের কিছু প্রসঙ্গ। এ-পত্রদ্বয়ের মধ্যেও তাঁর ব্যাপক অধ্যয়নের ইঙ্গিত আছে। সমকালীন সময়ে ঢাকার প্রগতি সাহিত্য-আন্দোলনের কিছু কথাও এখানে পাওয়া যায়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যকর্ম সম্পর্কে সোমেনের ভাবনার প্রকাশ ঘটেছে সর্বশেষ পত্রটিতে।

সংকলিত পত্রগুচ্ছের প্রথম পাঁচটি পত্রই পূর্বে প্রকাশিত হয়েছে। তবু একটি বিশেষ কারণে আমরা এই পঞ্চ-পত্র প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছি। দিলীপ মজুমদার সম্পাদিত 'সোমেন চন্দ ও তাঁর রচনাসংগ্রহ' (প্রথম খণ্ড) গ্রন্থে এই পত্রগুচ্ছের একটি খণ্ডিত এবং অসম্পূর্ণ পাঠ প্রকাশিত হয়েছে। তিনি পত্রগুলোর সম্পূর্ণ পাঠ পাননি, ফলে তাঁর পক্ষে সম্পূর্ণ চিঠি প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। কলকাতা থেকে প্রকাশিত 'নূতন লেখা' (প্রথম বর্ষ।। দ্বিতীয় সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৪৯) ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকায় সোমেন চন্দ সম্পর্কে নির্মলকুমার ঘোষের লেখা একটি প্রবন্ধে পত্রের যে-যে অংশ ব্যবহৃত হয়েছিল, সম্পাদক দিলীপ মজুমদার তা-ই উদ্ধৃত করেছেন। নির্মলকুমার ঘোষের কাছে লেখা সোমেন চন্দের চারটি পত্র কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত সম্পাদিত 'সাহিত্য-চিন্তা' সাময়িক-পত্রের ১০ম বর্ষ বিশেষ সংখ্যায় (সোমেন চন্দ স্মরণ সংখ্যা, এপ্রিল ১৯৮১) সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়। বাংলাদেশে ঐ পত্রিকা দুর্লভ। অথচ সোমেন-মানস অনুধাবন এবং সোমেন-চর্চার জন্য এই পত্র-চারটি অতি জরুরী এবং গুরুত্বপূর্ণ। সেদিক বিবেচনা করে আমরা 'সাহিত্যচিন্তা'র পাঠ অবলম্বনে এবং একটি চিঠির মূল পাণ্ডুলিপি দেখে প্রথম চারটি পত্র সংকলিত করেছি। অচ্যুতকুমার গোস্বামীর কাছে লেখা চিঠিটি আমরা 'সোমেন চন্দ ও তাঁর রচনাসংগ্রহ' (প্রথম খণ্ড) থেকে গ্রহণ করেছি।

অমৃতকুমার দত্তের কাছে লেখা পত্রদ্বয়, আমাদের জানা মতে ইতঃ-পূর্বে প্রকাশিত হয়নি। এই পত্রদ্বয় অমৃতকুমার দত্তের হুগলী-নিবাসী বন্ধু জনার্দন বসুর সৌজন্যে পেয়েছি। হুগলীর উত্তরপাড়া পাঠাগারে জনার্দন বসুর সঙ্গে সোমেন চন্দ বিষয়ে আলোচনা-সূত্রে তিনি আমাকে অমৃতকুমার দত্তের কথা জানান এবং তাঁর কাছে লেখা সোমেন চন্দের পত্রদ্বয়ের কপি আমাকে দেন।

দু-একটি বানান-সংশোধন ব্যতীত পত্রের পাঠ পরিবর্তন করা হয়নি। আশা করি, সোমেন চন্দের এই পত্রগুচ্ছ সোমেন-মানস বিশ্লেষণে গুরুত্ব-পূর্ণ উপাদান হিসেবে বিবেচিত হবে এবং বাংলাদেশে সোমেন-চর্চায় দেখা দেবে নতুন উৎসাহ-আগ্রহ।

ক. নির্মলকুমার ঘোষকে[১] লেখা পত্র

পত্র : এক

ঢাকা
৪৭ লালমোহন সাহা স্ট্রীট,
পো. উয়ারী।
১৯৩৮

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনার চিঠি দেখেছি, 'সবুজ বাংলার কথা'ও[২] পেয়েছি। ভালো লাগলো, আপনার কথাগুলি চমৎকার----তাতে আপনার এবং পত্রিকার নীতি আমার সঙ্গে সম্পূর্ণ মেলে, বিশেষত----'অর্থনৈতিক পীড়নের দুঃসহ ক্লেশ যাদের মনে সৃষ্টি করেছে কোনো প্রচণ্ড ক্ষোভ---যে ক্ষোভ ভূমিকম্প ও আগ্নেয়গিরির লাভা প্রভাবে এক একদিন আত্মপ্রকাশ করে---নিমেষের মধ্যে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় বহু শতাব্দীর সঞ্চিত অসাম্য ও বঞ্চনার অহমিকা,----যৌবনের পথনির্দেশ তো তারাই দেবে।' আর 'মানুষের সমাজ গড়ে ওঠবার পর থেকে আজ অবধি প্রায় একই নীতি সর্বদেশে অনুসৃত হয়ে এসেছে। এর ফলে সর্বসাধারণের কল্যাণ হয়ে থাকুক আর নাই থাকুক একথা অনস্বীকার্য যে লাভ ও সুবিধার কথা বলতে গেলে আঠারো আনারই মালিকানা জনকয়েক লোকের হাতে গিয়ে পড়েছে।' ---'আজ বিপ্লবের প্রয়োজন হয়েছে,-- যে বিপ্লব দেবে আমূল সংস্কার।'[৩] খুবই ভালো লাগলো, আমি নিজেই অনুভব করছি যেন। আশীর্বাদ করুন, আমার এই বিপ্লবের অনুভূতি আমার সাহিত্যসাধনার সর্বাঙ্গে যেন জড়িয়ে থাকে।

আর এই বিপ্লবের অনুভূতি কেবল আমার নয়, আরও অনেক সাহিত্যসেবকের মনেই জেগেছে মনে হয়, তার মধ্যে হয়তো অনেকেই প্রকাশ করতে পারছে না, বা অনেকের কণ্ঠই ক্ষীণ হয়ে গেছে তথাকথিত সাহিত্য-ডিক্টেটরদের গোলমালে, কিন্তু সেই অনুভূতির অস্তিত্ব আছে অনেকের মনেই----এইসব দেখে মনে হয়, আগামী দশ বছরে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস হবে একটা উজ্জ্বল অধ্যায়, একটা বৈপ্লবিক অপূর্ব সৃষ্টি।[৪]

আমি একটা উপন্যাস লিখছি এখন, এবং সেটা শেষ হতে বেশী দেরী নেই। এটা শেষ হলে আগামী ক্রীসমাসে কলকাতায় যাওয়ার ইচ্ছা আছে। আপনি 'নবশক্তি'র গল্পটার প্রকাশের কথা লিখেছেন----ভালো কথা, ওরা আমাকে পারিশ্রমিক দেয়নি[৫]---আপনি ওদের দিয়ে সেটা ছাপিয়ে নেয়ার কথা লিখেছেন। কিন্তু আমার নিজের সেই গল্পটা পছন্দ হয় না, বিশেষত প্রথম দিকের ডায়লগগুলি কেমন অস্বাভাবিক হয়ে গেছে, অবশ্যি তা বদলানো যেতে পারে----কিন্তু আসল কথা, আমার যা নীতি, তা প্রকাশ পায়নি সেই গল্পে----কাজেই প্রকাশ করতে ইচ্ছা হয়না। তবে কেটে ছেঁটে আরও ছোট করে অন্যান্য গল্পের সাথে প্রকাশ করা যেতে পারে। 'নবশক্তি'তে এর আগে আমার আর একটি গল্প প্রকাশিত হয়েছে, 'মুখোস' নামে।[৬]

কিন্তু শীঘ্রই সেই উপন্যাস, যেটা এখন লিখছি, সেটা ছাড়াও ছোট-গল্পের বই বের করবার ইচ্ছা আমার ভয়ানক এবং সেইজন্য বিশেষ নির্বাচিত রচনাও আছে আমার হাতে কিন্তু এই ব্যাপারে যে আর্থিক আনুকূল্যের দরকার----আপনার কাছে বলতে বাধা নেই---তা আমার সম্প্রতি মোটেই নেই। লেখককে নিজে খরচ না করে বই প্রকাশ করবার উপায় যদি থাকে---যেমন ধরুন, চুক্তি করে পাবলিশার্সরাও সে ভার নেয়----আপনার কাছে সে-বিষয়ে আমি পরামর্শ চাই। এ সম্বন্ধে আমার মোটেই অভিজ্ঞতা নেই, আপনার আছে। তবে আন্দাজ করতে পারি, আমি যে-উপায়ের কথা জিজ্ঞেস করলাম, তা হয়তো আমার মতো অখ্যাতনামা লেখকের বেলায় সম্ভব হয় না। তারা তো প্রবাসী, ভারতবর্ষ পছন্দ করে আগে। 'অগ্রগতি'তেও[৭] এমন প্রচুর লিখিনি যাতে ওরা প্রকাশ করতে পারে। তাছাড়া আপনিও সেখানে নেই। প্রকাশিতের মধ্যে মাত্র চারটি গল্প বইয়ের জন্য নির্বাচিত হতে পারে: অন্ধ শ্রীবিলাস, অমিল, মুখোস, দুই পরিচ্ছেদ[৮] (পরিবর্তিত হয়ে)---আর কয়েকটি আমার হাতে। কিন্তু আবার, আমার যে ভাবে প্রকাশের ইচ্ছা তাতে আমার নিজে না ছাপালে চলে না। গল্পগুলি অধিকাংশই বিদ্রূপাত্মক----আমার ইচ্ছা, প্রত্যেক গল্পের সঙ্গে ছবি দেয়া। এ বিষয়ে সবচেয়ে পছন্দ হয় শৈল চক্রবর্তী।[৯] Bernerd Shaw[১০]-এর Short Stories Scraps and Shavings নিশ্চয় দেখেছেন, তাতে John Farleigh-র আঁকা কী চমৎকার Wood Engravings ! কাজেই এরকম সম্ভব করতে আমার দুরাশা আছে।

তবে চেষ্টা করবো শেষ পর্যন্ত, তাতে যদি পুস্তক প্রকাশের দেরীও হয়, তা-ও হোক। এ সম্বন্ধে আমি সব সময় কেবল আপনার পরামর্শের কথাই ভাবি। কারণ, আমার উপলব্ধ অনুভূতি, আর আমি নিজে, এই ঢাকা শহরে একা।[১১] অমৃত[১২] খুবই সরল, আর যাকে বলে খুবই sincere, যাকে একবার ভালো চোখে দেখলো, বা ভালোবাসলো বা শ্রদ্ধা করলো, তার জন্যে এমন কি প্রাণ পর্যন্ত দিতে পারে যেন, তার হয়ে মানুষের সঙ্গে মারামারি করতে পারে। এই তো, আপনি বলতে সে অজ্ঞান, বঙ্কিম-গঠিত ব্যাপারের সময়[১৩] লোকের সঙ্গে আপনাকে নিয়ে যা তর্ক করেছে, তা দেখলে আশ্চর্য হতে হয়, একজন কাউকে চোখে পর্যন্ত না দেখে কেউ যে তার সম্বন্ধে এতো জাগ্রত হতে পারে, তা বিশ্বাস করা যায় না সহজে। আর কেবল আপনিই না, বলেছি তো যাকে একবার ভালো-বাসলো বা শ্রদ্ধা করলো তো, তাইতেই। এই আমার জন্যেও মানুষের সঙ্গে ঝগড়া করে আসতে পারে। এটা সরলতা; যে এটা বুঝলো, সেই তার সঙ্গে চলতে পারলো। কিন্তু বিপদ এই, মতের দৃঢ়তা নেই, যে-কোনো লোকের দ্বারা অনুপ্রাণিত হতে পারে। তাই মাঝে মাঝে একা মনে হয়, আমার উপলব্ধির পেছনে কোন অনুপ্রেরণা না পেয়ে মাঝে মাঝে অবসাদ আসে। অবশ্য সবুজ বাংলার কথায় তা পেলাম।

আমার বইয়ের দাম হবে যথাসম্ভব কম---সর্বসাধারণের সুবিধার জন্যে, যাতে আমার মতো লোকও পড়তে পারে। এতে আপনি হাসবেন জানি----কিন্তু এ বিষয়ে আমি রোঁমা রোঁলার[১৪] কথা মানি এবং বিশ্বাস করি: 'খাঁটি আর্টের নিবেদন এমন গভীর যে, তা নিম্নতম অধিকারীর হৃদয়েও সাড়া দেয়। প্রমাণ, শেক্সপীয়রের[১৫] নাটক---ও জিনিষের বোঝা-বার জন্যে বৈদগ্ধ্যের দরকার হতে পারে কিন্তু বোধ করবার পক্ষে প্রকৃতি যা দিয়েছে তাই যথেষ্ট'। অবশ্যি, আমার লেখাতে খাঁটি আর্ট বলে যদি কিছু থাকে!---আমার বইয়ের বাইরের বিলাসী চাকচিক্যের চেয়ে নতুনত্ব বেশী হবে, এই ইচ্ছা। বিশ্বাস করবেন না, আমাদের অনেক বাংলা বইয়ের চকচকে প্রচ্ছদপটের চেয়ে Penguin Books-এর অনা-ড়ম্বর আর uniform প্রচ্ছদপটও আমার ভালো লাগে।

সে যাই হোক, নিজে খরচ দিয়ে প্রকাশ করলে কলকাতার চেয়ে ঢাকায় অনেক সুবিধা----এখানে ছাপিয়ে কলকাতার কোনো পাবলিশার্স দিয়ে পাবলিশ করলেই তো হয়।

ইতিমধ্যে, অর্থাৎ ক্রীসমাসের আগে, ছোটদের একটা ছোট উপন্যাসও লিখবো। আর এই তিনটি জিনিস শেষ করে তারপর কয়েকটি নাটিকা লিখবো—বাংলায় ভালো নাটকের নিতান্তই অভাব।[১৬]

'সবুজ বাংলার কথা'র গল্পটি যে অবস্থায় বেরিয়েছে, তাই বরং আমার ভালো লাগলো। 'কাব্য-পরিচয়ে' আপনার কবিতা নির্বাচিত হয়েছে একথা অনেক আগেই শুনেছি। খুসী হয়েছি। প্রেমেন্দ্র মিত্রের[১৭] দুটি কবিতা এবার খুবই ভালো লাগলো---'কবিতা'[১৮] আর 'আনন্দ-বাজারে'র---পড়তে পড়তে এক রকম মুখস্থ হয়ে গেছে।

ঢাকার একমাত্র উল্লেখযোগ্য খবর এই, এখানে এ বৎসর সাহিত্য-আলোচনার একটা sensation টের পাওয়া যাচ্ছে। একটি দু'টি পত্রিকা নয়, এমনও আছে যাদের নাম আপনিও হয়তো শোনেন নি, অথচ সারা বছরই চলছে।[১৯]

এত লম্বা চিঠি পড়ে আপনি বিরক্ত হবেন জানি কিন্তু উপায় নেই, আরও বাকী রইলো। অনেক দরকারী কথা এতদিন জমে ছিল বলেই চিঠি এত বড়ো হয়ে গেল। দু'দুটো চিঠি আপনি এদিকে লিখলেন, অথচ আমার কাছে একটিও নেই। এ দেখে আমাকে আপনি ভুলে যাচ্ছেন মনে হয়।

যতো শিগ্‌গির হয়, এ চিঠির উত্তর দেবেন কিন্তু। আমি ভালো, আপনার শারীরিক কুশল কামনা করি। আমার শ্রদ্ধা আর নমস্কার জানবেন। কপিলবাবুর[২০] চিঠি দেখেছি, তাঁকে আমার নমস্কার জানাচ্ছি। ইতি—

আপনাদের
সোমেন

পু:---আপনাকে একটি কথা বলতে ভুলে গেছি, আমার দিনগুলি এখন মনোরম----আর অনেক, আপনাকে বলতে বাধা নেই, অনেক মানসিক (সাংসারিক) বিপর্যয়ের বাধা-বিপত্তি এড়িয়েও এখনকার দিন-গুলি কী ভালো লাগে! তার প্রধান কারণ, উপন্যাস লেখার উত্তেজনা। কবে শেষ হবে, সেই চিন্তাই করি।[২১]

এখনকার রাতগুলো আমার জীবনে স্মরণীয় হয়ে থাকলো, (আর আপনি তার প্রথম শ্রোতা) উপন্যাস লেখা ব্যর্থই হোক আর অব্যর্থই হোক---মাঝে মাঝে একেকটি রাত কখন যে শেষ হয়ে যায়, টেরও পাইনে।[২২] অমৃতের কাছে এসব জানাই নে, কারণ সে ক্ষেপিয়ে মারবে।[২৩]

পত্র : দুই

৪৭, লালমোহন সাহা স্ট্রীট,
পো. উয়ারী, ঢাকা।
৯ই নভেম্বর, বুধবার

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

ক্রীসমাসে আমার কলকাতায় আসবার ইচ্ছা আছে, আপনাকে তা বলেছি। তখন লিখিত উপন্যাসখানা[১] নিয়ে আসবো, সেটা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। উপন্যাসখানা গ্রাম এবং শহর, দু'য়ে মিশিয়ে লেখা। তবে বেশীর ভাগই গ্রাম। আপনি অভিজ্ঞতার কথা লিখেছেন: গ্রাম্য অভিজ্ঞতা আমার প্রচুর---এমন কি, যা কেন্দ্র করে শরৎচন্দ্র[২] থেকে আরম্ভ করে অনেকেই কতোগুলি sweet উপন্যাস রচনা করেছেন বৈষ্ণবদের সেই আখড়ার সাথেও ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত আমি, কিন্তু এতদিন সে সব সম্বন্ধে কিছু লিখিনি এই ভেবে যে, ওসব পুরনো হয়ে গেছে, এখন নতুন দৃষ্টি-ভঙ্গীর দরকার। কিন্তু বছরখানেক সেই নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর কোন পথই খুঁজে পেতাম না, এখন কতকটা পেয়েছি বলে মনে হচ্ছে,[৩] সেটা আমার বর্তমান উপন্যাসে[৪] ফলবে। নিজের ওপর নির্ভরতায় এবং নিজেরই বিচারশক্তিতে আমার মনে হয়, বইটি প্রকাশিত হলে অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। আপনি 'বিত্তহীন মধ্যবিত্ত'দের[৫] নিয়ে লিখতে বলেছেন, এদের ছাড়া আমি আর কাউকে নিয়ে লিখবো না জানবেন (তবে এঁদেরই কথা বলবার সুবিধের জন্যে ধনীদের সাহায্য নিতে পারি, সেটা লিখবার পদ্ধতি) আমার বর্তমান উপন্যাস তাঁদেরই নিয়ে। তবে আমার নায়ককে সম্পূর্ণ আড়ালে রেখেছি, সে কী এবং কে, এ পর্যন্ত জানতে দিইনি, সর্ব-শেষ কী হবে এখনও বলতে পারিনে। প্লটটি অল্পেতে বলি শুনুন: একটি বন্যাপীড়িত গ্রাম, সেখানে কোনো এক বিত্তহীন মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে,

মালতী——ঘরে অন্নের চিন্তা কিন্তু ভয়ানক স্বপ্নবিলাসী, তার বারান্দার নীচে জল দেখে তার আনন্দ হয়, বন্যার সেই নতুন জলে পা ডুবিয়ে সেই জলেই নিজের চেহারা দেখতে তার সুখ; অথচ পেছনে ছোট ভাই-বোন, মা-বাপ, ঠাকুমা মিলে এক মস্ত সংসার——চেঁচামিচি, দু'হাত মেলে খাবার ভিক্ষার কান্না—এর মধ্যেও আমার এই মেয়ে নিশ্চিন্তে স্বপ্ন দেখে। ইতিমধ্যে গ্রামে ফ্লাড রিলিফ কমিটি বসেছে, শুধু চাল দেয়া এদের রীতি, অর্থ নয়, সেখানকারই রজত নামে এক ছেলে এই সূত্রেই মালতীদের সাথে পরিচিত হলো, মালতীর স্বপ্ন দেখায় সে আঘাত করলো, তার স্বপ্ন সে ভেঙে দিলো। এখানে রজতের সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার। সে আমার উপন্যাসের নায়ক——ইচ্ছা করেই আমি তাকে (শুধু তাকেই) অস্বাভাবিক করেছি; তার কারণ, যা আমি বলতে চাই নইলে তা আর বলা হয় না। একটা নতুন বলিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গী শুধু এরই ওপর বেশী ছায়াপাত করেছে, ইংরিজিতে যাকে adventurer বলে, কতকটা সেই জাতীয় চরিত্র, প্রথম থেকে শেষ অবধি সে সকলের কাছে অজ্ঞাত অথচ সকলের সাথেই ঘনিষ্ঠতার অন্ত নেই। রজতের ideology প্রচার করতে গিয়ে অনেকখানেই আমাকে চেপে যেতে হয়েছে, পুরোপুরি খোলা হতে পারিনি; এইখানেই একটা কথা আমার বার-বার মনে হয়েছে, সেটা এই, দেশে যদি চারপাশে এমনি নাগপাশের বাঁধন না থাকতো, অর্থাৎ দেশে যদি ন্যাশনাল গভর্নমেন্ট থাকতো তবে আমাদের বিশেষভাবে উপন্যাস সাহিত্যের গতি এই যে রুদ্ধ হয়ে এসেছে, তার বাঁধন খুলতো। বৃহত্তর চিন্তা আমরা কি কম করি, মার্কস-হেগেল-কোল-স্ট্রাচি-শকি অনেকেরই কণ্ঠস্থ নয়?[৬] কিন্তু আমাদের এই দারিদ্র্যপীড়িত, দুঃখক্লিষ্ট জীবনে বৃহত্তর চিন্তাকে মিশ খাইয়ে একটু আশার বাণী শোনায় কে? ক্যাপিটালিজম আর ইম্পিরিয়ালিজম-এ অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ, প্রথমটির বিরুদ্ধে কোন লেখকের অভিযান করতে হলে, দ্বিতীয়টির [বিরুদ্ধেও] করতে হয়; সুতরাং বই প্রকাশিত হবার পরদিনই বন্ধ। তখন কী আশা, স্পর্ধা, সাহস আর পুঁজি নিয়ে গরীব লেখক আর একখানা উপন্যাসের সূচনা করবে? জমিদার-দের তো অনেকেই গাল দিলো (শুধু গাল-ই, উপায় বের করলে না কেউ); কিন্তু মূলে কী, তা কি কেউ জানে না? জানলেও জানাবার সাহস তাদের কোথায়?——এই বয়সে আমার যতখানি intellectual অনুভূতি-অভিজ্ঞতা আছে, তার সবখানি আমি নায়ক রজতকে ঢেলে দিয়েছি, কতোদূর সফল হলাম কে জানে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের[৭] কথা আপনি বলেন, আমিও বলি,---স্বীকার করি, শ্রেষ্ঠ গল্পলেখকের যা গুণ তার সবই আছে তাঁর মধ্যে---বিশিষ্ট রচনাভঙ্গী, অভিনব চরিত্র সৃষ্টি, অপূর্ব অভিজ্ঞতার উপলব্ধি, সবই আছে, কিন্তু পড়াশোনা কম বলে মনে হয়। কল্পনা করা যায়, এই প্রতিভার সঙ্গে বিস্তর পড়াশোনার যোগ থাকলে[৮] আরও কতো বড়ো সাহিত্যই না আমরা পেতাম।

তারপর প্লটের কথা বলছিলাম---রজত মালতীর স্বপ্ন ভেঙ্গে দিলো। তার মনে সে বিপ্লবের আগুন জ্বালিয়ে দিলো। বেশী বেগ পেতে হলোনা, কারণ উপকরণ সামনেই আছে, মালতীর হাতের কাছেই সব দৃষ্টান্ত দেখিয়ে সরলভাবে বুঝিয়ে দিলো। তারপর সে চলে এলো। আর এক গ্রাম; এখানকার যিনি জমিদার, তিনি থাকেন সহরে, একজন উচ্চ এডুকেশনাল অফিসর, বছরে একবার দেশে আসেন, সেবারও এসেছেন, সঙ্গে দুটি শিক্ষিত মেয়ে আর স্ত্রী। রজত তাঁদের সঙ্গে পরিচিত হলো। এখনও পরিচয়ের বাঁধুনি দৃঢ় হচ্ছে, বাকী আছে কেবল শেষটুকু। উপন্যাসখানা বইয়ের আকারে তিনশো পৃষ্ঠা সম্ভবত হবে।[৯]

সেদিন বার্নার্ড শ'র *Intelligent Woman's Guide to Socialism* খানা কিনেছি, এখন সময় মতো পড়ছি। সন্তোষ সেন[১০] নামক ভদ্রলোকের কথা বলেছিলেন, অমৃতর সাথে দুই দিন তাঁর বাসায় গিয়েছি, পাইনি। আর একদিন যাবো। আসলে, অমৃত সারাদিনে সেই সন্ধ্যেবেলা একটু সময় পায়, তখনই শুধু সেই ভদ্রলোকের কাছে যাওয়া যায় কিন্তু সন্ধ্যাবেলায় কখনও কাউকে বাসায় পাওয়া যায় নাকি? আপনি বইয়ের কথা লিখেছেন কিন্তু এ সম্বন্ধে প্রাথমিক জ্ঞানটুকু পেতে হলে প্রথমই যে কারুর সাহায্য ছাড়া আমি একা সেই বই পড়ে বুঝতে পারবো, মনে হয় না।) দুরূহ বিষয় শুনেছি। সে যা হোক, আমি চেষ্টা করবো।

গৌরপ্রিয় দাশগুপ্ত[১১] আপনার কাছে চিঠি লিখেছিলেন দেখতে পাচ্ছি। ওঁর সাথে আমাদের ঘনিষ্ঠতা আছে, একজন সাহিত্য-সেবক। এক 'নটরাজ' পত্রিকার সম্পাদক ছাড়া অন্যভাবেও হয়তো আপনি ওঁকে চিনতে পারবেন: ওরিয়েন্টাল ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর ঢাকার ব্রাঞ্চ-ম্যানেজার বি. ভি. দাশগুপ্ত ওঁর বাবা। আমি ভালোই আছি। আশা করি আপনি ভালো আছেন। আমার নমস্কার জানবেন।

আশা করি ক্রীসমাসে আপনার সাথে দেখা হবে। কলকাতা থাকতেই আমার একান্ত ইচ্ছা, কলকাতা সম্বন্ধে একখানা বিশদ উপন্যাস লিখবার ইচ্ছা ভবিষ্যতের জন্যে তুলে রেখেছি। এখানে মোটেই ভালো লাগছে না।[১২] কিরণশঙ্করের[১৩] কবিতার বই শিগগিরই বেরুচ্ছে; এবারে ঢাকা হলের[১৪] বার্ষিকী বাসন্তিকা[১৫] তাঁরই সম্পাদনায় বের হবে। ইতি—

আপনাদের
সোমেন

পত্র : তিন

৪৭, লালমোহন সাহা স্ট্রীট
পো. ওয়ারী, ঢাকা।
৯. ১২. '৩৮

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

অনেকদিন যাবত আপনার কোন সংবাদ পাচ্ছি না। এর মধ্যে কয়েকদিনের জন্যে অন্যত্র গিয়েছিলাম, এসে দেখি, অমৃত ঢাকায় নেই। শুনতে পেলাম সে এখন কলকাতায়। এতদিনে তার সাথে আপনার দেখা হয়ে থাকবে। কিন্তু আমি সবদিক থেকে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, কোনপক্ষে কোন সংবাদ নেই। 'সবুজ বাংলার কথা'র কথা ভেবে চিন্তিত হচ্ছি—— অমৃতর স্থানে কে ভার নিলো[১], গত সংখ্যা ঢাকায় দেখলাম না কেন ইত্যাদি। অমৃতর সাথে আমার কিছু কথা আছে, অথচ ঠিকানা জানিনে।[২] আর, সে-ও কেমন, আজ কতোদিন যাবত গিয়েছে, একটা চিঠি পর্যন্ত দিলে না। এমন খেয়ালী আর আমি কোনদিন দেখিনি।

তাছাড়া, আপনি? দাবী কথাটা যদিও আপনার মুখেই শুনে কৃতার্থ হয়েছি, কিন্তু আপনার ওপরও যে উল্টো কারুর দাবী থাকতে পারে, সে-কথাটা আপনাকে অস্বীকার করতে দেখে আশ্চর্য হচ্ছি।

সেদিন একখানা বই এনেছি, বইটি পুরনো----লেখকের নামই শুধু আগে জানতাম, তা-ও আপটন সিনক্লেয়ারের একখানা উপন্যাসে তাঁর উল্লেখ দেখেছিলাম—যোসেফ ম্যাজিনির[৩] *Duties of Man*. এই বই

পড়ে একটা ভয় হয় সেটা আপনাকে বলছি।----ম্যাজিনি যখন বেঁচে ছিলেন, সে আজকের কথা নয়, তিনি এবং তাঁর মতো অনেক লোককে পেয়েও ইটালী তাঁদের কাম্যকেও বরণ করে নিতে পারলো না, অর্থাৎ সমাজব্যবস্থায় ভারতের অনুরূপ হয়েও এবং অতো আগেও অনেক চিন্তাশীল লোকদের বক্তৃতায় সোস্যালিজমের আভাস পেয়েও, সেখানে আজ ফ্যাসিজম। এই দেখে মনে হয়, ভারতেরও তাই হবে, শেষ পর্যন্ত সেই বহু নিন্দিত ডেমোক্রেসী-রায় বা ভারতের অগণ্য দরিদ্র অধিবাসীর আশা সফল হবে না, কাল নয় বৃটিশের হাত থেকে ছাড়া পেলো, পরশু পড়বে গিয়ে ধনীদের হাতে।[৪] আপনাকে আমার শ্রদ্ধার নমস্কার জানাচ্ছি। আপনার কুশল কামনা করি। আশা করি, শীঘ্রই উত্তর পাবো।

ইতি---
আপনাদের
সোমেন

পত্র : চার

৪৭, লালমোহন সাহা স্ট্রীট
ওয়ারী, ঢাকা।
১৪. ১২. '৩৮

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনার চিঠি পেয়ে সুখী হয়েছি। আমি ঠিক করেছিলাম বৌবাজার বা হ্যারিসন রোডের দিক দিয়েই থাকবো খরচ সাপেক্ষ হলেও কারণ, হোটেলেই যখন থাকা। কিন্তু এখন দেখছি আপনার ওখানেই উঠতে পারি—আপনার এমন অযাচিত জিজ্ঞাসায় খুব ভালো লাগছে।[১] দূরে হলে ক্ষতি নেই, আমার কাজই এমন কী! আপনার সাথে সাক্ষাতের কামনা করেছিলাম, তাই সারাক্ষণে পূরণ হলো দেখে ভালো লাগছে। বলতে দ্বিধা নেই, কলকাতায় এই আমার প্রথম আসা। কিন্তু মনে হয়, কলকাতার অর্ধেকই যেন আমার জানা, আর বাকী অর্ধেক হয়তো অজানা। আমি খুব সম্ভব আগামী রবিবার কিংবা মঙ্গলবার (রবিবারই আপাতত যাবার ইচ্ছে) এখান থেকে রওনা দেবো। সেকথা ভালো করে কাল

কি পরশু আপনাকে জানাবো, সেই অনুযায়ী স্টেশনে লোক রাখতে হবে—(আপনাকে আমি চিনবো, না হলে অমৃতকে পাঠালেও হয় কিন্তু ওর ওপর আমার বিশেষ ভরসা হয় না, ঠিকানা (!) সংগ্রহ করেও এখনও যখন একটা চিঠি লিখতে পারলে না।)[২] নাহ'লে অসুবিধে হবে, খুব অসুবিধে হবে, আমি একা। যাহোক, এখান থেকে যাবার ঠিক দিনটি আমি কাল কি পরশু চিঠিতে জানাবো।[৩]

উপন্যাস অনেক আগেই শেষ হয়েছে 'প্রবর্তকে' ছাপানয় মত দিতে পারি।[৪] এখন একটা নাটক লিখছি,[৫] যাবার আগেই শেষ করবার ইচ্ছে, তাই সময় নেই, গল্প লেখার ফুরসৎ হয় না। তাছাড়া তিনচারটি বই এখন হাতে, সেগুলি ইতিমধ্যে শেষ না করে দিলেই নয়। পারি তো কলকাতায় গিয়ে যা হয় লিখবো।

আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার জানবেন। আমি ভালো, আপনার কুশল কামনা করি। ইতি—

আপনাদের
সোমেন

খ. অচ্যুতকুমার গোস্বামীকে লেখা পত্র

পত্র : পাঁচ

ঢাকা
১৭. ৮. ৪০

প্রিয় অচ্যুতবাবু[১],

যে বয়সে মানুষের সামান্য অঞ্চলাঘাতেও মূর্ছা যাবার উপক্রম হয় সে বয়স অনেক আগে পার হয়ে এলেও কী জানি কেন আবার নূতন করে আপনার একটি চিঠির আঘাত পাব বলে অধীর প্রতীক্ষায় অপেক্ষা করছিলাম। এতদিনে সেই চিঠি এলো। আপনাকে ধন্যবাদ।

সন্তান[২] সম্বন্ধে আপনার কোন উদ্বেগের কারণই নেই, কারণ, পিতা[৩] হয়ে আমার দায়িত্ব বড়ো কম নয়। সে যথারীতি বেড়ে উঠছে এবং ভূমিষ্ঠ-সম্ভাবনা পূর্ব-নির্ধারিত সময়েই হবে আশা করি। তাকে ভালবাসি

বলে যথেষ্ট ক্ষতিপূরণ দিতে হচ্ছে। দু'বেলা তো যেতে হচ্ছেই, তাছাড়া রণেশবাবুকে[৪] প্রুফ দেখানো, লেখা সংগ্রহ করা ইত্যাদি। অতএব মহাশয় কেবল উদ্বেগে অধীর না হয়ে কিছু কাজের ভারও গ্রহণ করুন এসে, অমন পথে বসিয়ে পালানো চলবে না।

·· কে[৫] নিয়ে মুস্কিলে পড়া গেছে, তিনি কী রকম লেখা দেন সেই ভয়ে সবিশেষ চিন্তিত আছি। আপনি যতজন সাহিত্যিকের বাড়ী পারেন Raid করে আসবেন এবং আমাদের সম্ভান-সম্ভাবনাকে সবিস্তারে জানিয়ে আসবেন। হীরেন মুখার্জী[৬] এবং সুরেন গোস্বামীর[৭] ঠিকানা যে কোন উপায়ে সংগ্রহ করে তাঁদের সঙ্গে আলাপ করে আসতে পারলে ভালো হয়। তাছাড়া···অফিস[৮] থেকে যে কোন উপায়ে আমার লেখাটি উদ্ধার করবেন। অবিশ্যি কিরণকে[৯] দিয়ে ইতিমধ্যে এক চিঠি দিয়েছি। লেখাটির নাম : 'সংকেত'। লেখকের নাম : সোমেন চন্দ।

অবশেষে আপনার প্রতি আমি কয়েকটি সাবধান বাণী উচ্চারণ করছি:[১০]

১. রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে যখন-তখন যা-তা খাবেন না।
২. রাস্তায় গাড়ী-ঘোড়া দেখে চলবেন।
৩. ···অথবা ঐ জাতীয় অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে গিয়ে বেশীক্ষণ কাটাবেন না।

আর কী লিখবো। আপনি তাড়াতাড়ি এসে পড়ুন। ফরিদপুর[১১] হয়ে আসবেন কী? কবে রওনা দেবেন জানাবেন। আমি ভালো আছি বটে, কিন্তু আপনার বিহনে কৃশ হয়ে যাচ্ছি।[১২]

পার্কের সন্ধ্যা-বৈঠক যথারীতি চলছে।[১৩] রণেশবাবু আপনার ভূমিকা-টির খুব প্রশংসা করছেন।[১৪] নৃপেনবাবু[১৫] লিখতে রাজী হয়েছেন শুনে খুশি হয়েছি।

আপনার শরীর কেমন? সাবধান হয়ে চলবেন। আমার গভীর, আন্তরিক, বিশেষ ভালোবাসা জানবেন।

ইতি
সোমেন

গ. অমৃতকুমার দত্তকে লেখা চিঠি

পত্র : ছয়

৪৭, লালমোহন সাহা স্ট্রীট
ওয়ারী, ঢাকা।
১৫. ১২. ১৯৩৮

প্রিয় অমৃত,[১]

কলকাতা গিয়ে এভাবে হাওয়া হয়ে যাবে ভাবিনি। আশা করেছিলাম তোমার চিঠি পাবো। কিন্তু মানুষের সব আশা পূর্ণ হয় না। আমি ভেবে অবাক হই, তুমি এতদিনেও একটা চিঠি দিতে পারলে না। গতকাল নির্মলবাবুর[২] কাছে চিঠি দিয়েছি। আগামী মঙ্গলবার কলকাতার উদ্দেশ্যে আমি ঢাকা থেকে রওনা হবো। তুমি অবশ্যই শিয়ালদা[৩] স্টেশনে থাকবে, তা না হলে খুব অসুবিধে হবে। আমি কিছুই জানি না --চিনি না, কখনো কলকাতা যাইনি। ভালোই হবে, তোমাকে নিয়ে কলকাতার সব জায়গা দেখা যাবে। ভালো কথা, কলকাতায় আমি নির্মলবাবুর বাড়ীতেই থাকবো।

জানতে পারলাম, র‍্যালফ ফক্সের[৪] লেখা *The Novel and the People* বইখানা কলকাতায় পাওয়া যায়। আমার জন্য অনুগ্রহ করে এক কপি সংগ্রহ করার চেষ্টা করো। বইখানি পড়ার আমার খুবই ইচ্ছা। সতীশদার[৫] কাছে বইখানির নাম শুনেছি। 'বন্যা' প্রায় শেষ করেছি। যাবার সময় কলকাতা নিয়ে যাবো। 'প্রবর্তক' পত্রিকায় ছাপাতে চেষ্টা করবো। একটা নাটকও[৬] লিখতে আরম্ভ করেছি। আশা করি দু'এক দিনের মধ্যে শেষ হবে। নাটকটা 'আনন্দবাজার' পত্রিকায় ছাপাতে পারলে ভালো হয়।

ঢাকায় সবাই ভালো আছে, তবে তোমার বিহনে আমরা সবাই কৃশ হয়ে যাচ্ছি। খাওয়া-দাওয়া ঠিকমত হচ্ছে না।[৭] অচ্যুতবাবুর শরীরটা তেমন ভালো যাচ্ছে না।[৮]

আশা করি, যথাসময়ে তুমি স্টেশনে থাকবে, তা না হলে আমার খুব কষ্ট হবে। নির্মলবাবুর সঙ্গে এ-ব্যাপারে যোগাযোগ করতে পারো। স্টেশনে থেকো কিন্তু, না হলে আমার খুব অসুবিধে হবে।

আমি ভালো আছি। তোমার কুশল কামনা করি।

ইতি
সোমেন

পুনঃ—তোমাদের বাসার সকলে ভালো আছে। আমি গত পরশু গিয়েছিলাম তোমাদের বাসায়। তোমার বাবার সঙ্গে কথা হয়েছে অনেকক্ষণ।

পত্র : সাত

৪৭, লালমোহন সাহা স্ট্রীট
ওয়ারী, ঢাকা।
১০. ৯. ১৯৪০

প্রিয় অমৃত,

গতকাল কলকাতা থেকে লেখা তোমার চিঠিটা পেলাম। তুমি আর কতদিন কলকাতা থাকবে? এদিকে কাজের চাপে আমি দিশেহারা। অচ্যুতবাবু এখনো ঢাকা ফেরেননি। কিছুদিন পূর্বে তাঁর চিঠি পেয়েছি। আমি শীঘ্র তাঁকে ঢাকা আসতে লিখেছি।

'ক্রান্তি'-র[১] কাজ প্রায় শেষের পথে। তুমি এসে তরতাজা গ্রন্থ দেখতে পাবে। প্রগতি লেখক সংঘের কাজ ভালোভাবে চলছে। কিছুদিনের মধ্যেই একটা সভা করতে চাই। সতীশবাবুর সঙ্গে এ-বিষয়ে কথা হয়েছে। অনুষ্ঠানে কাজী আবদুল ওদুদ,[২] কিংবা বুদ্ধদেব বসু[৩] অথবা সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে[৪] আনার চেষ্টা করবো। তুমি প্রাথমিক আলোচনা শেষ করে আসতে পারো কি? ডিসেম্বর মাসের শেষদিকে আমি কলকাতা যাবো। তখন তাঁদের সঙ্গে দেখা করবো।

গত কয়েকদিন রেল-শ্রমিকদের নিয়ে বেশ ঝামেলায় ছিলাম। লেখার জন্য একটুও সময় পাই না। তবু লিখতে হবে, মেহনতী মানুষের জন্য, সর্বহারা মানুষের জন্য, আমাদের লিখতে হবে। র‍্যালফ ফক্‌সের বই পড়ে আমি অন্তরে অনুপ্রেরণা পাচ্ছি। কডওয়েলের[৫] বইটিও আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে। এই না হলে কি মহৎ সাহিত্যিক হওয়া যায়? স্পেনের পপুলার ফ্রন্ট সরকারের সমর্থনে তাঁদের আত্মবিসর্জন ইতিহাসে উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। আশার কথা বাংলা সাহিত্যের তরুণ লেখকরা এ-দিকে সচেতন হচ্ছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বড় লেখক হতে পারেন, তাঁর লেখায় প্রগতিচিন্তার ছাপ আছে। 'অমৃতস্য পুত্রাঃ' পড়ে মনে হলো, তিনি ভালো লিখবেন। তবে রাজনীতির সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ মনে হয় খুব ক্ষীণ,[৬] আর পড়া-লেখাও কম। কলকাতা গেলে মানিকবাবুর[৭] সঙ্গে দেখা করবো।

বিপ্লবের জন্য একজন লেখক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন। আমাদের সেভাবে প্রস্তুত হতে হবে। গোর্কির[৮] কথাই চিন্তা করো। সৌখিন সাহিত্য করার আর সময় নেই।

অচ্যুতবাবুর ঠিকানা নিশ্চয়ই তুমি জানো। ওনার সঙ্গে যোগাযোগ করো। পারলে দু'জনে একসঙ্গে চলে এসো। নতুন ভালো কোন বই কিনেছো কি? আসার সময় পত্র-পত্রিকা নিয়ে এসো। নির্মলবাবুর কোন সংবাদ জানো কি? অনেক দিন হলো তাঁর সঙ্গে আমার যোগাযোগ নেই। প্রগতি সাহিত্য সম্পর্কে ওনার ধারণা একটু বিরূপ বলে মনে হয়।

আমি ভালো আছি। তোমার কুশল কামনা করি। যত শীঘ্র পারো ঢাকা চলে এসো। সান্ধ্য-বৈঠকে তোমার অভাব অনুভব করছি।

ইতি
সোমেন

তথ্যনির্দেশ : ভূমিকা

১. সোমেন চন্দের জীবন-কথা রচনায় উৎসরূপে ব্যবহার করা হয়েছে নিম্নোক্ত গ্রন্থ ও প্রবন্ধসমূহ---

ক. দিলীপ মজুমদার (সম্পাদক), সোমেন চন্দ ও তাঁর রচনা-সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড, ১৯৭৩, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৭৮, নবজাতক প্রকাশন, কলকাতা; ঐ, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৯৭৭, পূর্বোক্ত।

খ. রণেশ দাশগুপ্ত (সম্পাদক), সোমেন চন্দের গল্পগুচ্ছ, ১৯৭৩, কালিকলম প্রকাশনী, ঢাকা।

গ. কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, "সোমেন চন্দ ও সমকাল", 'সাহিত্যচিন্তা' (সম্পাদক : কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত), ১০ম বর্ষ : দ্বিতীয় সংখ্যা (সোমেন চন্দ স্মরণ সংখ্যা), এপ্রিল ১৯৮১, কলকাতা।

ঘ. কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত (সম্পাদক), সোমেন চন্দের সুনির্বাচিত গল্প, ১৯৮৩, সারস্বত লাইব্রেরী, কলকাতা।

৬. বিশ্বজিৎ ঘোষ, "সোমেন চন্দের জীবন ও প্রসঙ্গ-কথা", 'সাহিত্য পত্রিকা' (সম্পাদক: মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান), ঊনত্রিংশ বর্ষ: দ্বিতীয় সংখ্যা, ফেব্রুয়ারী ১৯৮৬, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

চ. হায়াৎ মামুদ, সোমেন চন্দ, ১৯৮৭, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

২. হায়াৎ মামুদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১

৩. দ্রষ্টব্য: রচনাসংগ্রহ-১, পৃ. ২৭৬

৪. দ্রষ্টব্য: অচ্যুত গোস্বামী, "সোমেন চন্দ ও তাঁর সাহিত্য", 'এষা', ৪র্থ বর্ষ ১ম সংখ্যা, ১৩৭৬, কলকাতা। উদ্ধৃত: রচনাসংগ্রহ--১, পৃ. ২৮৩

৫. দ্রষ্টব্য: রচনাসংগ্রহ--১, পৃ. ৩৪১

৬. বিশ্বজিৎ ঘোষ, "ঢাকায় প্রগতি লেখক-আন্দোলন: প্রসঙ্গত সোমেন চন্দ", ভারতে সংগঠিত প্রগতি সংস্কৃতি-আন্দোলনের অর্ধ-শতাব্দী পূর্তি স্মারক সংকলন-গ্রন্থ-অন্তর্গত প্রবন্ধ, সম্পাদক: নীতীশ বিশ্বাস, ১৯৮৬, ঐকতান, কলকাতা।

৭. দ্রষ্টব্য: রচনাসংগ্রহ-১, পৃ. ৩৬৭

তথ্যনির্দেশ : পত্রগুচ্ছ

পত্রসংখ্যা : এক

১. সোমেন চন্দের অন্যতম সুহৃদ নির্মলকুমার ঘোষ ছিলেন কলকাতা থেকে প্রকাশিত 'অগ্রগতি' (১৩৪৪/১৯৩৭), 'সবুজ বাংলা কথা' (১৩৪৫/১৯৩৮), 'বালিগঞ্জ' (১৩৪৬/১৯৩৯)---এই পত্রিকাত্রয়ের সম্পাদক। কবি এবং প্রাবন্ধিক হিসেবেও তাঁর খ্যাতি রয়েছে। পেশায় তিনি ছিলেন আইনজীবী। তিনি বয়সে সোমেন চন্দের থেকে বছর দশেকের বড় ছিলেন। ১৯৩৭ সালে তিনি একবার ঢাকায় আসেন। ঢাকায় অমৃতকুমার দত্ত নির্মল-কুমার ঘোষের সঙ্গে সোমেন চন্দের পরিচয় করিয়ে দেন এবং

ক্রমে তাঁদের মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে। সোমেন জীবনে সর্বমোট দু'বার কলকাতা যান, এবং দু'বারই তিনি শ্রী ঘোষের বাড়িতে ওঠেন। সোমেন চন্দের সাহিত্য-প্রতিভা বিকাশে নির্মলকুমার ঘোষের অনুপ্রেরণা অবশ্যই স্বীকার্য। বর্তমান নিবন্ধের দুই-সংখ্যক পত্রে সোমেন নিজেই উল্লেখ করেছেন নির্মলকুমার ঘোষের অনুপ্রেরণার কথা। নির্মলকুমার ঘোষ-সম্পাদিত পত্রিকাত্রয়ে সোমেনের নয়টি গল্প এবং তাঁর একমাত্র উপন্যাস 'বন্যা' প্রকাশিত হয়।

২. নির্মলকুমার ঘোষ-সম্পাদিত ত্রিশের দশকে কলকাতার একটি অন্যতম সাহিত্য পত্রিকা। 'সবুজ বাংলার কথা' প্রথম প্রকাশিত হয় ৮ই আশ্বিন ১৩৪৫ বঙ্গাব্দে। পত্রিকাটির সর্বমোট আটটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। প্রথম সংখ্যায় সোমেন চন্দের 'অমিল' গল্পটি মুদ্রিত হয়।

৩. পত্রে উদ্ধৃত অংশদ্বয় 'সবুজ বাংলার কথা' পত্রিকার প্রথম সংখ্যার সম্পাদকীয় নিবন্ধ 'প্রথম সংখ্যা প্রথম সংখ্যা নয়' থেকে সোমেন চয়ন করেছেন। নির্মলকুমার ঘোষ-লিখিত সম্পাদকীয় পাঠ করে সোমেন উদ্বুদ্ধ হন----সে-কথাই এখানে ব্যক্ত হয়েছে।

৪. সমকালীন সময়ে 'পরিচয়'-'কবিতা'-'চতুরঙ্গ'---প্রভৃতি পত্রিকাকে কেন্দ্র করে একদল তরুণ প্রগতিশীল সাহিত্যিকের আবির্ভাবে সোমেন আশাবাদী হয়ে এ-কথা লেখেন। এ-সময় তিনি নিজেও রোম্যান্টিকতার পথ পরিহার করে, বাস্তব জীবনাশ্রয়ী প্রগতিশীল সাহিত্য রচনায় মনোনিবেশ করেন।

৫. ত্রিশের দশকে কলকাতার অন্যতম সাহিত্যপত্র 'নবশক্তি'। 'নবশক্তি' পত্রিকায় সোমেন একটি ছোট উপন্যাস পাঠান এবং সেটি ছাপা হয় আশ্বিন ১৩৪৫ (১৯৩৮)-এ শারদীয় 'নবশক্তি'-তে। তখন 'নবশক্তি' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন 'তিতাস একটি নদীর নাম' (১৯৫৬) উপন্যাসের জনয়িতা অদ্বৈত মল্ল-বর্মণ (১৯১৪-১৯৫১)। সোমেনের ঐ উপন্যাসটি আজ অবধি উদ্ধার করা যায়নি, এমন কি জানা যায়নি তার নাম---এখন সে-সাময়িকী

দুর্লভ। প্রথম উপন্যাসের পারিশ্রমিক বাবদ 'নবশক্তি' কর্তৃপক্ষ কোন অর্থ দেয়নি বলে সোমেন এ-কথা লিখেছেন এবং 'নবশক্তি'তে নতুন লেখা পাঠাতেও তাঁর অনাগ্রহ ব্যক্ত করেছেন।

৬. ১৯৩৮ সালে সাপ্তাহিক 'নবশক্তি' পত্রিকায় প্রকাশিত সোমেনের এ-গল্পটি আজ পর্যন্ত উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

৭. 'অগ্রগতি' ছিল ত্রিশের দশকে কলকাতার অন্যতম প্রগতিশীল সাহিত্য পত্রিকা। প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৩৭ সালে। পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন আশু চট্টোপাধ্যায়। কিন্তু পত্রিকাটি পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন নির্মলকুমার ঘোষ, বিরাম মুখোপাধ্যায় ও মণি বাগচি। ১৯৩৮ সালের দিকে নির্মলকুমার ঘোষ কিছুদিনের জন্য এই পত্রিকার ম্যানেজার ছিলেন। পরে তিনি এ-পত্রিকার সম্পাদকের দায়িত্বও পালন করেন। 'অগ্রগতি' পত্রিকায় সোমেন চন্দের 'ভালো-না-লাগার শেষ' এবং 'অন্ধ শ্রীবিলাশের অনেক দিনের একদিন' শীর্ষক গল্পদ্বয় প্রকাশিত হয়। প্রায় তিন বছর চলার পর ১৯৩৯ সালের শেষ দিকে পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়।

৮. 'দুই পরিচ্ছেদ' গল্পটি ১৯৩৮ সালে প্রকাশিত হয়। তবে কোন পত্রিকায় তা পত্রস্থ হয়, তা জানা যায়নি। এ-গল্পটিও আজ অবধি উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

৯. ত্রিশ-চল্লিশের দশকে স্বনাম-খ্যাত চিত্রকর এবং প্রচ্ছদ-শিল্পী শৈল চক্রবর্তী।

১০. বিখ্যাত ইংরেজ সাহিত্যিক বার্নার্ড শ' (১৮৫৬-১৯৫০)। তাঁর উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্ম—*Pleasant and Unpleasant* (১৮৯৮), *Man and Superman* (১৯০৩), *Arms and the Man* (১৯২৮), *You Never Can Tell* (১৯৪০), *The Intelligent Woman's Guide to Socialism and Capitalism* (১৯২৮) ইত্যাদি।

১১. ১৯৩৭-৩৮ সালের দিকে সোমেন চন্দ মোটামুটি নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করেছেন। এ-সময় তিনি অনেক লিখেছেন, অধিকাংশ

লেখাই রোম্যান্টিক ভাবাশ্রিত এবং উচ্ছ্বাসময়। কিন্তু সোমেনের এসব লেখার সংবাদ বন্ধুরাও জানতো না। ক্রমে প্রগতি লেখক সংঘ সংগঠিত হলে সোমেনের এ-নৈঃসঙ্গ্য দূর হয়।

১২. অমৃতকুমার দত্ত ছিলেন সোমেনের অন্যতম বন্ধু। তিনি বয়সে ছিলেন সোমেনের সমানবয়সী। তিনি ছিলেন নির্মলকুমার ঘোষের লেখার অন্যতম আগ্রহী পাঠক। অমৃতকুমারের বিস্তৃত পরিচয় ছয়-সংখ্যক পত্রের তথ্যনির্দেশে দ্রষ্টব্য।

১৩. ১৯৩৮ সালে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৩৮-১৮৯৪) জন্ম-শতবার্ষিকী সমগ্র বঙ্গদেশে উদ্‌যাপিত হয়। নির্মলকুমার ঘোষ এ-সময় একটি প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে ভিন্নধর্মী বক্তব্য প্রকাশ করলে বেশ তর্ক-বিতর্কের সৃষ্টি হয়। অমৃতকুমার দত্ত এ-সময় কথায় এবং লেখায় নির্মলকুমারের বক্তব্যকে সুদৃঢ়ভাবে সমর্থন করেছিলেন। সেই প্রসঙ্গই এখানে বলা হয়েছে।

১৪. বিখ্যাত ফরাসী সাহিত্যিক-দার্শনিক রোমাঁ রোলাঁ (১৮৬৬-১৯৪৪)। দশ খণ্ডে রচিত 'জাঁ ক্রিস্তফ' গ্রন্থের জন্য তিনি ১৯১৫ খ্রীস্টাব্দে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

১৫. ইংরেজ কবি ও নাট্যকার উইলিয়ম শেক্সপীয়র (১৫৬৪--১৬১৬)। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থসমূহ হচ্ছে—*The Sonnets* (১৬০৯), *Romeo and Juliet* (১৫৯৪-৯৫), *Othello* (১৬০৪--০৫), *King Lear* (১৬০৫-০৬), *Macbeth* (১৬০৫-০৬); *Antony and Cleopatra* (১৬০৬-০৭)।

১৬. নাটক রচনাতেও সোমেন মনোনিবেশ করেছিলেন। তিনি যথার্থই বুঝেছিলেন বাংলা সাহিত্যে নাট্যশাখার দুর্বলতা। সোমেনের লেখা মাত্র দুটো একাঙ্কিকা আজ অবধি পাওয়া গেছে। 'বিপ্লব' ও 'প্রস্তাবনা' নামের ঐ একাঙ্কিকাদ্বয় ঢাকা থেকে প্রকাশিত 'শান্তি' পত্রিকায় মুদ্রিত হয়। প্রগতিশীল কবি-সমালোচক কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত 'শান্তি' পত্রিকার সহযোগী সম্পাদক ছিলেন। 'আনন্দবাজার' পত্রিকায় তাঁর লেখা আর একটি একাঙ্কিকা প্রকাশের জন্য মনোনীত হয়েছিল বলে নির্মলকুমার

ঘোষ জানিয়েছেন (দ্রষ্টব্য : রচনাসংগ্রহ-২, পৃ. ১৭৩)। কিন্তু তা পরবর্তীকালে আর মুদ্রিত হয়নি এবং পাণ্ডুলিপিও পাওয়া যায়নি।

১৭. বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শক্তিমান লেখক প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪-)। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলো হচ্ছে--কাব্য : প্রথমা (১৯৩২), সম্রাট (১৯৪০), সাগর থেকে ফেরা (১৯৫৬), হরিণ চিতা চিল (১৯৫৯) ; উপন্যাস : পাঁক (১৯২৬), মিছিল (১৯৩৩), আগামীকাল (১৯৩৪) ; ছোটগল্প : বেনামী বন্দর (১৯৩০), পুতুল ও প্রতিমা (১৯৩২), মৃত্তিকা (১৯৩২), মহানগর (১৯৪৩)। এ-সময় বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত 'কবিতা' (১৯৩৫) পত্রিকায় প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'নীলকণ্ঠ' এবং শারদীয় আনন্দবাজারে 'বাঘের কপিশ চোখে' শীর্ষক দুটি কবিতা প্রকাশিত হয়। সোমেন চন্দ সম্ভবত ঐ কবিতাদ্বয়ের কথাই উল্লেখ করেছেন।

১৮. বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪) সম্পাদিত 'কবিতা' পত্রিকা (১৯৩৫)। 'কবিতা' কবিতা-বিষয়ে বাংলা ভাষায় প্রথম ব্যতিক্রমধর্মী পত্রিকা। ত্রিশের দশকে এই পত্রিকাকে কেন্দ্র করে বাংলা সাহিত্যে একদল শক্তিমান কবির আবির্ভাব ঘটে।

১৯. ঢাকা শহরে এ-সময়ে বেশ কিছু সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশিত হতো। অধিকাংশ পত্রিকাই বেশী দিন চলতো না। এ-সময় ঢাকা শহরের অন্যতম তিনটি প্রগতিশীল সাহিত্যপত্র হচ্ছে---'প্রভাতী' (১৯৩৬), 'সোনার বাংলা' (১৯৩৪) এবং 'শান্তি' (১৯৩৪)।

২০. নির্মলকুমার ঘোষের সহকর্মী স্বনাম-খ্যাত প্রাবন্ধিক কপিল-প্রসাদ ভট্টাচার্য। কপিলপ্রসাদ এবং নির্মলবাবু যৌথভাবে 'সবুজ বাংলার কথা' পত্রিকা প্রকাশ করেন। পেশায় ইঞ্জিনীয়ার কপিল-প্রসাদ গল্প-কবিতাও লিখতেন। 'বাংলার নদ-নদী পরিকল্পনা' তাঁর একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

২১. 'বন্যা' উপন্যাস রচনার কথা সোমেন বলতে চেয়েছেন এখানে। পরবর্তীকালে উপন্যাসটির প্রথম খণ্ড নির্মলকুমার ঘোষ-সম্পাদিত 'বালিগঞ্জ' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়।

২২. সারা দিন সোমেন বাইরে কাটাতেন, লিখতে বসতেন রাতে। তখন তাদের বাড়িতে বৈদ্যুতিক বাতি ছিল না, রাত জেগে লণ্ঠনের আলোয় তিনি লিখতেন।

২৩, শৈশব কাল থেকেই সোমেন ছিলেন খুব লাজুক প্রকৃতির ছেলে। লজ্জাবশতই তিনি অন্তরঙ্গ বন্ধুদের কাছে তাঁর লেখার খবর বলতেন না। প্রকাশিত লেখা বন্ধুদের দেখাতেও ছিল তাঁর চরম অনাগ্রহ। বন্ধুরা, বিশেষত অমৃতকুমার, তাঁকে ভাবুক মানুষ হিসেবে ক্ষ্যাপাতো বলে তিনি এ-কথা লিখেছেন।

পত্রসংখ্যা : দুই

১. 'বন্যা'র কথা লিখেছেন সোমেন। 'বন্যা'র প্রথম খণ্ড 'বালিগঞ্জ' (মাঘ ১৩৪৬ থেকে মাঘ ১৩৪৭) পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে মুদ্রিত হয়। এ-সময় সোমেন 'বন্যা'র দ্বিতীয় খণ্ড লেখাও শেষ করেন। কিন্তু 'বন্যা'র দ্বিতীয় খণ্ড কোথাও প্রকাশিত হয়নি। এ-প্রসঙ্গে সোমেন চন্দের রচনাসংগ্রহের সম্পাদক দিলীপ মজুমদার লিখেছেন :

> "বালিগঞ্জ' পত্রিকায় 'বন্যা' উপন্যাস প্রকাশিত হবার সময় সোমেন উপন্যাসের দ্বিতীয় পর্ব লেখাও শেষ করেন। দুই-তিনটি খাতায় লেখা উপন্যাসের পাণ্ডুলিপিটি তিনি নির্মল-বাবুর নিকট পাঠিয়েছিলেন। নির্মলবাবু মালতীকে নায়িকা করে রচনাগুলি নূতন করে লেখার অনুরোধ জানিয়ে খাতাগুলো ফেরত দেন। কিন্তু ইতিমধ্যে 'বালিগঞ্জ' পত্রিকা বন্ধ হয়ে যায় এবং তার কিছুদিন পরে ১৯৪২ সালের ৮ই মার্চ সোমেন নিহত হন। 'বন্যা'র ২য় খণ্ডের পাণ্ডুলিপিগুলির হদিশ আর পাওয়া যায়নি।"

—দ্রষ্টব্য : রচনাসংগ্রহ-২, পৃ. ২০৭

২. বাংলা সাহিত্যের বিখ্যাত ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬-১৯৩৮)। তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাস--পল্লীসমাজ (১৯১৬, দেনা-পাওনা (১৯২৩), দত্তা (১৯১৮), চরিত্রহীন

(১৯১৭), গৃহদাহ (১৯২০), শ্রীকান্ত (১৯১৭-৩৩), শেষপ্রশ্ন (১৯৩১), পথের দাবী (১৯২৬) ইত্যাদি।

৩. এই সময় সোমেন চন্দ মার্কসবাদে দীক্ষা নিচ্ছিলেন। কমিউনিস্ট নেতা সতীশ পাকড়াশীর সান্নিধ্যে এসে তিনি মার্কসবাদ-লেনিন-বাদের দৃষ্টিতে সাহিত্যকে দেখা শুরু করেন। এ-সময় থেকে সমাজবিকাশের হাতিয়ার হিসেবেই তিনি সাহিত্যকে দেখতেন। তিনি ক্রমশ জনজীবন ও মৃত্তিকামূল-সংলগ্ন হয়ে সাহিত্য-রচনায় মনোনিবেশ করেন।

৪. 'বন্যা' উপন্যাস।

৫. এই তথ্য থেকে বোঝা যায়, নির্মলকুমার ঘোষ সোমেনকে অনুপ্রেরণা দিয়ে চিঠি লিখতেন। সোমেনের লেখা-প্রকাশ এবং সাহিত্যচিন্তা বিকাশে নির্মলকুমার ঘোষ পরম শুভানুধ্যায়ীর ভূমিকা পালন করেন। নির্মলকুমার ঘোষের কথানুযায়ী সোমেন মধ্যবিত্ত-নিম্নবিত্তের জীবন নিয়ে লেখেন 'বন্যা'। 'বন্যা' সমকালীন সাহিত্যের পটভূমিতে একটি ব্যতিক্রমধর্মী সৃষ্টি। এ-প্রসঙ্গে অচ্যুত গোস্বামীর মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য:

> "১৯৩৭-৩৮-এ যাঁরা খ্যাতিমান লেখক ছিলেন, এই আখ্যান-বস্তুর মত চিন্তাধারা তখন তাঁদের চেতনার বাইরে ছিল। রাজনীতিকে বাদ না দিয়েও যে সাহিত্য হতে পারে এ-কথা দু'একজন মাত্র অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে বলতে শুরু করেছেন, কিন্তু এইসব আলোচনাকারীদের অস্বীকার করেই চলে-ছিলেন সাহিত্যরথীরা। এর মধ্যেই 'বন্যা'র শক্তিশালী লেখক প্রমাণ করলেন কী করে বন্যার অবস্থায় অপরিসীম দুঃখ-যন্ত্রণার মধ্যেও জীবন নিজস্ব ছন্দে চিত্রিত হয়ে ওঠে এবং সেই ছন্দের মধ্যে স্পষ্টতম সুর হয়ে দেখা দেয় পরাধীন মানবমনের স্বাধীনতার তীব্র আকাঙ্ক্ষা। '৩৮ সনে যদি 'বন্যা' ভালভাবে আত্মপ্রকাশের সুযোগ পেত, তবে এই বছরের সবচেয়ে প্রগতিশীল লেখা বলে সেটা পরিচিত হতে পারত অনায়াসে।

—দ্রষ্টব্য : রচনাসংগ্রহ—১, পৃ. ৩১৫—১৬

৬. ১৯৩৭—৩৮ সাল থেকেই সোমেন মার্কসবাদ--লেনিনবাদ চর্চার জন্য বিভিন্ন ধরনের বই পড়তেন। সমাজতান্ত্রিক সাহিত্যও এ-সময়ে তাঁর পাঠক-হৃদয়কে আকৃষ্ট করেছে প্রবলভাবে। তাঁর পত্রাবলিতে বিখ্যাত লেখকদের নানা-প্রসঙ্গ প্রায়ই আমরা লক্ষ্য করি। নিজের সাহিত্য-প্রতিভা বিকাশে এ-সব গ্রন্থ-পাঠ অত্যাবশ্যক বলে তিনি বিবেচনা করতেন।

৭. বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শক্তিমান লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-১৯৫৬)। তাঁর উল্লেখযোগ্য সৃষ্টিকর্ম—উপন্যাস : পদ্মা নদীর মাঝি (১৯৩৬), পুতুল নাচের ইতিকথা (১৯৩৬), অমৃতস্য পুত্রাঃ (১৯৩৮), চিহ্ন (১৯৪৭), চতুষ্কোণ (১৯৪৮); ছোটগল্প : অতসী মামী ও অন্যান্য গল্প (১৯৩৫), প্রাগৈতিহাসিক (১৯৩৭), বৌ (১৯৪৩), সমুদ্রের স্বাদ (১৯৪৩), ভেজাল (১৯৪৪) ইত্যাদি।

৮. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে সোমেন শক্তিমান লেখক হিসেবে যথার্থই চিনেছিলেন। তাঁর 'অমৃতস্য পুত্রাঃ' (১৯৩৮) উপন্যাসটি সোমেন আগ্রহের সঙ্গে পাঠ করেন, যেখানে প্রথম মার্কসবাদী চিন্তার প্রকাশ ঘটেছে। অমৃতকুমার দত্তের কাছে লেখা (সাত সংখ্যক পত্র) পত্রে তার উল্লেখ আছে।

৯. 'বন্যা' প্রথম খণ্ডের পৃষ্ঠা সংখ্যা ৭০ (দ্রষ্টব্য : রচনাসংগ্রহ—২)। সুতরাং বুঝা যাচ্ছে 'বন্যা'-র দ্বিতীয় খণ্ড বেশ বড় ছিল। তাই সোমেন ভেবেছিলেন যে, দু'খণ্ড মিলে প্রায় তিন শ' পৃষ্ঠার উপন্যাস হবে 'বন্যা'। দ্বিতীয় খণ্ড মুদ্রিত হয়নি, এমন কি তার পাণ্ডুলিপিও নির্মলকুমার ঘোষের কাছ থেকে হারিয়ে গেছে।

১০. সন্তোষ সেন ঢাকায় থাকতেন। তাঁর কোন পরিচয় আমরা উদ্ধার করতে পারিনি।

১১. সোমেন চন্দের ঘনিষ্ঠ সুহৃদ গৌরপ্রিয় দাশগুপ্ত কলকাতার ১৩৯ নং শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রোডে থাকতেন। তিনি ছিলেন সাহিত্য-রসিক। কলকাতার তৎকালীন অন্যতম সাহিত্যপত্র 'নটরাজ' তাঁর সম্পাদনাতেই প্রকাশিত হত। ১৯৪০ সালে সোমেন ও গৌরপ্রিয়র একটি ফটো তোলা হয় গৌরপ্রিয়র

বাসাতে। সোমেন চন্দের একমাত্র ছবি, যা বর্তমানে বিভিন্ন গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকায় দেখা যায়, তা ঐ ফটো থেকেই গৃহীত। এ-ছাড়া সোমেনের আর কোন ছবি পাওয়া যায়নি।

১২. তরুণ বয়সের আবেগের টানে সোমেন কখনো কখনো ভাবতেন, তিনি, বুদ্ধদেব বসুর মতো, পাকাপাকিভাবে কলকাতা গিয়ে সাহিত্যচর্চা করবেন। কিন্তু কলকাতায় তেমন কোন আত্মীয়-স্বজন না থাকায়, তাঁর আর যাওয়া হয়নি। ঢাকায় প্রগতি লেখক সংঘ গঠিত হলে নতুন বন্ধুদের সান্নিধ্যে এসে সোমেনের নিঃসঙ্গতা কেটে যায় এবং তখন পরিহার করেন কল্লোলিত-তিলোত্তমা নগরী কলকাতা যাবার বাসনা।

১৩. প্রগতিশীল কবি কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ-নিবাসী কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত ভারতে প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক-আন্দোলনের অন্যতম অগ্রসেনানী। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'স্বপ্ন-কামনা' ১৯৩৮ সালের ডিসেম্বর মাসে ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়। 'স্বপ্ন-কামনা'-র ভূমিকা লিখেছিলেন কবি জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪)। তাঁর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কাব্য হচ্ছে 'নতুন আঁচড়' (১৯৪১), 'স্বর ও অন্যান্য কবিতা' (১৯৫৩), 'দিনযাপন' (১৯৬২), 'বৃষ্টি এলে' (১৯৭৩), এবং 'এই এক সময়' (১৯৭৩)। সোমেন চন্দ ও তাঁর সাহিত্যকে ব্যাপকভাবে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ-প্রচারের ক্ষেত্রে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। সোমেন চন্দ সম্পর্কে তিনি বহু প্রবন্ধ-নিবন্ধ রচনা করেন। 'সাহিত্য-চিন্তা' নামে একটি উল্লেখযোগ্য সাহিত্য পত্রিকার তিনি সম্পাদক।

১৪. বর্তমানে ঢাকা হলের নাম শহীদুল্লাহ্ হল। ১৯২১ সালে তিনটি আবাসিক হল নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়---এই তিনটি হল হচ্ছে ঢাকা হল, জগন্নাথ হল এবং মুসলিম হল (যার বর্তমান নাম সলিমুল্লাহ মুসলিম হল)।

১৫. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঢাকা হলের মুখপত্রের (বার্ষিকী) নাম ছিল 'শতদল'। ১৯৩৮ সালে কবি কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের সম্পাদনায় 'শতদল' প্রকাশিত হয়। জগন্নাথ হলের মুখপত্রের নাম ছিল 'বাসন্তিকা'। সোমেন ভুল করে ঢাকা হলের মুখপত্রের নাম 'শতদল'-এর পরিবর্তে 'বাসন্তিকা' লিখেছেন।

পত্রসংখ্যা : তিন

১. কলকাতা থেকে অমৃতকুমার দত্তের নামে 'সবুজ বাংলার কথা' আসতো। কোন কারণে এক সংখ্যা পত্রিকা আসতে বিলম্ব হয়েছে বলে সোমেন এ-কথা লিখেছেন।

২. অমৃতকুমার দত্তের বাসায় গিয়ে তিনি ঠিকানা সংগ্রহ করে কলকাতায় চিঠি লিখেছিলেন।

৩. যোসেফ ম্যাজিনি (১৮০৫--১৮৭২) ইতালির বিখ্যাত লেখক, চিন্তাবিদ এবং বিপ্লবী। তাঁর একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে *Duties of Man* (১৮৫৯)।

৪. এখানে হতাশাবাদী চিন্তার প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু সোমেনের ভবিষ্যৎবাণী যে কত দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ছিল, তা আজ আমাদের কাছে সুস্পষ্ট। বোধ করি, সোমেন শ্রেণীসংগ্রাম ছাড়া সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না-এ কথাই বলতে চেয়েছেন। কিন্তু নির্মলকুমার ঘোষ কমিউনিস্ট-বিরোধী ছিলেন বলে, তা সরাসরি লেখেননি। উত্তরকালে, এই কারণেই সোমেন চন্দের সঙ্গে নির্মলকুমার ঘোষের বন্ধুত্বের সুতো ছিন্ন হয়ে যায়।

পত্রসংখ্যা : চার

১. ৯-১২-১৯৩৮ তারিখে লেখা সোমেন চন্দের চিঠি পেয়ে সম্ভবত নির্মলকুমার ঘোষ দ্রুত সোমেনকে লিখে জানান যে, কলকাতায় সোমেন যেন তাঁর বাড়িতেই ওঠেন। চিঠির এ-অংশ পড়ে, এমন অনুমান হওয়াই স্বাভাবিক।

২. অমৃতকুমার দত্তের বাড়িতে গিয়ে ঠিকানা সংগ্রহ করে ১৫. ১২. ১৯৩৮ তারিখে অমৃতকুমারের কাছেও সোমেন একটা চিঠি লেখেন। সে-চিঠি আমরা আলোচ্য নিবন্ধে পত্রস্থ করেছি।

৩. শিয়ালদা স্টেশনে পৌঁছে তাঁর জন্যে অপেক্ষারত নির্মলকুমার ঘোষের কোন লোক বা অমৃতকুমারকে দেখতে না পেয়ে

সোমেন অন্যের কাছে জিজ্ঞেস করে নির্মলকুমার ঘোষের বালিগঞ্জস্থ বাসায় উপস্থিত হন। নির্মলবাবু তখন বাসায় ছিলেন না, কিন্তু তাঁর মা সোমেনের থাকার ব্যবস্থা করে দেন। আদালত থেকে আইন ব্যবসা সেরে এডভোকেট নির্মলকুমার ঘোষ সন্ধ্যায় বাড়ি এসে সোমেনকে দেখে লজ্জিত এবং একই সঙ্গে আনন্দিত হয়ে ওঠেন।

৪. উপন্যাসটি ('বন্যা') শেষ পর্যন্ত নির্মলকুমার ঘোষ সম্পাদিত 'বালিগঞ্জ' পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়।

৫. সম্ভবত নাম-না-জানা এই নাটকটি তিনি 'আনন্দবাজার' পত্রিকায় ছাপতে দেন। কিন্তু মনোনীত হয়েও শেষ পর্যন্ত তা আর 'আনন্দ-বাজার'-এ পত্রস্থ হয়নি।

পত্রসংখ্যা : পাঁচ

১. প্রগতিশীল সাহিত্যকর্মী এবং মার্কসবাদী প্রাবন্ধিক-সমালোচক অচ্যুত গোস্বামী (১৯১৭-১৯৮০) ছিলেন সোমেন চন্দের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ঢাকায় প্রগতি লেখক সংঘ গঠনে তাঁর ভূমিকা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। ঢাকা থেকে প্রকাশিত প্রগতিশীল সাহিত্যপত্র 'প্রতিরোধ' (১৯৪২)-এর সম্পাদক ছিলেক অচ্যুত গোস্বামী এবং কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত। অচ্যুত গোস্বামীর বাসাতেই ঢাকার প্রগতি লেখক সংঘের অধিকাংশ সাহিত্যবাসর বসতো। অচ্যুত গোস্বামীর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের নাম 'বাংলা উপন্যাসের ধারা' (১৩৬৪)। 'কানাগলির কাহিনী', 'মৎস্যগন্ধা', 'রাজ্যচ্যুত ঈশ্বর' তাঁর তিনটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। উত্তরজীবনে তিনি কলকাতার বিজয়গড় যতীশ রায় কলেজে ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। অচ্যুত গোস্বামীর বড় ভাই নৃপেন গোস্বামী ছিলেন দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক। নৃপেন গোস্বামী নিবন্ধকার হিসেবে ঢাকার প্রগতি লেখক সংঘের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। সোমেন চন্দের সাহিত্যকর্ম সম্পর্কে অচ্যুত গোস্বামী বহু প্রবন্ধ রচনা করেন।

২. 'সন্তান' দ্বারা সোমেন চন্দ সাহিত্য-সংকলন 'ক্রান্তি'কে বুঝাতে চেয়েছেন। রসিকতা কিংবা সতর্কতা এবং গোপনীয়তার জন্য সোমেন 'ক্রান্তি'-র পরিবর্তে 'সন্তান' শব্দ ব্যবহার করেছেন।

৩. সোমেন চন্দ ছিলেন 'ক্রান্তি'-র প্রকাশক, তাই সন্তান-রূপ 'ক্রান্তি'র পিতা হিসেবে নিজেকে উল্লেখ করেছেন।

৪. বাংলাদেশের প্রগতিশীল সাহিত্য-সংস্কৃতি আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা-পুরুষ রণেশ দাশগুপ্ত (জ. ১৯১২)। বর্তমানে তিনি কলকাতায় বসবাস করছেন এবং জড়িত আছেন সেখানকার প্রগতিশীল সাহিত্য-আন্দোলনের সঙ্গে। ঢাকায় প্রগতিশীল সাহিত্য-আন্দোলন বিকাশে তাঁর ঐতিহাসিক ভূমিকা সর্বজনবিদিত। মার্কসবাদী লেখক এবং সমালোচক হিসেবেও তিনি সমধিক পরিচিত। তিনি ছিলেন ঢাকার 'প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘের' সম্পাদক। প্রগতিশীল সাহিত্য-আন্দোলনের প্রাণপুরুষ ছিলেন বলে বিভিন্ন সময়ে তিনি একাধিকবার কারাবরণ করেন। সোমেন চন্দ সম্পর্কে তিনি বহু প্রবন্ধ-নিবন্ধ রচনা করেন এবং তিনিই প্রথম সোমেন চন্দের গল্পগুচ্ছ সম্পাদনা করে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন (১৯৭৩ সাল)। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে —'উপন্যাসের শিল্পরূপ' (১৯৫৯), 'শিল্পীর স্বাধীনতার প্রশ্নে' (১৯৬৬), 'আলো দিয়ে আলো জ্বালা' (১৯৭০), 'ফয়েজ আহমদের কবিতা' (১৯৬৯), আয়ত দৃষ্টিতে আয়ত রূপ (১৯৮৬) ইত্যাদি।

৫. এখানে সোমেন কোন্ লেখকের কথা বলতে চেয়েছেন, তা বুঝা যাচ্ছে না, সম্ভবত, কলকাতাবাসী কোন লেখক হবেন।

৬. প্রগতিশীল রাজনীতিবিদ-সাহিত্যিক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ছিলেন 'নিখিল ভারত সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি'র সাধারণ সম্পাদক। সমগ্র ভারতে ফ্যাসিবাদ-বিরোধী জনমত গড়ে তোলায় তিনি অবিস্মরণীয় ভূমিকা পালন করেন। কলকাতার প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘের অন্যতম প্রাণপুরুষ ছিলেন তিনি। ১৯৩৯ সালে কলকাতা থেকে 'প্রগতি লেখক সংঘে'র উদ্যোগে 'প্রগতি' নামের যে সংকলনগ্রন্থ প্রকাশিত হয়, তার সম্পাদক

ছিলেন হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এবং সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী। প্রগতি লেখক সংঘের শাখা স্থাপনের জন্য ১৯৩৮ সনে তিনি সাজ্জাদ জহীর এবং সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামীকে নিয়ে ঢাকা আসেন এবং কিশোর সোমেন চন্দের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। তাঁর স্মৃতিকথামূলক রচনা 'তরী হতে তীর' (১৯৭৪) গ্রন্থে ভারতে প্রগতি সংস্কৃতি আন্দোলনের একটা ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায়। তাঁর আর একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের নাম 'চক্ষুষা কাণঃ'।

৭. ভারতের প্রগতি সংস্কৃতি আন্দোলনের অন্যতম প্রাণপুরুষ অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী। তিনি ছিলেন প্রগতি লেখক সংঘ বাংলা শাখার প্রথম সম্পাদক। তিনি প্রগতি লেখক সংঘের উদ্যোগে প্রকাশিত 'প্রগতি' (১৯৩৯) সংকলন-গ্রন্থের যুগ্ম-সম্পাদক ছিলেন। ১৯৪২ সালের ৮ই মার্চ ঢাকার সূত্রাপুরে ফ্যাসিবিরোধী সম্মেলনে তিনি উপস্থিত ছিলেন। বাংলাদেশে প্রগতি লেখক সংঘ সংগঠনে তাঁর ঐতিহাসিক ভূমিকা অবিস্মরণীয়। ১৯৪৪ সালে তিনি অকালে মৃত্যুবরণ করেন।

৮. 'আনন্দবাজার' পত্রিকার অফিস। আনন্দবাজারে সোমেন চন্দের 'সংকেত' গল্পটি প্রকাশিত হয় ১৯৩৮ সনে। সম্ভবত, সোমেন চন্দের কাছে পত্রিকার কোন কপি না থাকায়, তিনি অচ্যুত গোস্বামীকে অনুরোধ করেছেন কলকাতা থেকে আনন্দবাজারের একটা কপি সংগ্রহ করতে।

৯. কবি কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত। বিস্তৃত পরিচয়ের জন্য দুই-সংখ্যক পত্রের তথ্যনির্দেশ দ্রষ্টব্য।

১০. বন্ধুর প্রতি সোমেনের ভালোবাসা ও আন্তরিকতা কত প্রগাঢ় ছিল, তা এই নির্দেশের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। অচ্যুত গোস্বামী একবার চর্মরোগে আক্রান্ত হয়ে পড়লে, সোমেন তাকে সেবা-শুশ্রূষায় ভালো করে তোলেন।

১১. অচ্যুত গোস্বামীর বাড়ি ছিল বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলায়। কলকাতা থেকে আসার সময় ফরিদপুর হয়ে আসবে কিনা— সোমেন তা-ই জানতে চেয়েছেন অচ্যুত গোস্বামীর কাছে।

১২. এ-উক্তির মধ্য দিয়ে সোমেন চন্দের কৌতুকপ্রিয় মনের সন্ধান পাই আমরা।

১৩. সোমেন চন্দ, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, রণেশ দাশগুপ্ত, অমৃতকুমার দত্ত, অচ্যুত গোস্বামী, সরলানন্দ সেন প্রমুখ প্রতিদিন সন্ধ্যায় মিলিত হতেন। কখনো তাঁরা বসতেন ভিক্টোরিয়া পার্কের সবুজ কার্পেটে, কখনো কোন হোটেলে, কখনো-বা বুড়িগঙ্গার তীরে।

১৪. 'ক্রান্তি' সংকলন-গ্রন্থের ভূমিকার খসড়া লিখেছিলেন অচ্যুত গোস্বামী। রণেশ দাশগুপ্ত তা দেখে দেন এবং প্রশংসা করেন।

১৫. নৃপেন গোস্বামী। অধ্যাপক গোস্বামী ছিলেন অচ্যুত গোস্বামীর বড় ভাই। তিনি 'ক্রান্তি' পত্রিকার জন্য লেখা দিতে সম্মত হওয়া সোমেন একথা লেখেন।

পত্রসংখ্যা : ছয়

১. ঢাকায় প্রগতি লেখক সংঘের অন্যতম সংগঠক অমৃতকুমার দত্ত। অল্প বয়সেই তিনি ব্যাঙ্কের চাকুরীতে ঢুকেছিলেন। তাঁর পিতা সুকুমার দত্ত ছিলেন ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের স্বনামধন্য শিক্ষক। অমৃতকুমার গণকবিতা লিখতে অধিক আগ্রহী ছিলেন। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'কয়েকটি পাতা' ঢাকা থেকে ১৯৪৩ সালে প্রকাশিত হয়, যা তিনি উৎসর্গ করেছিলেন সোমেন চন্দের স্মৃতির উদ্দেশে। অল্প বয়সেই তিনি বিখ্যাত ইটালিয়ান উপন্যাস 'ফন্টামারার' বাংলা অনুবাদ করেছিলেন। সোমেনের মৃত্যুর ন'মাস পরে প্রকাশিত 'সংকেত ও অন্যান্য গল্প'-এর (ডিসেম্বর ১৯৪২) প্রকাশক ছিলেন অমৃতকুমার দত্ত।

২. 'সবুজ বাংলার কথা', 'অগ্রগতি' ও 'বালিগঞ্জ' —এই পত্রিকাত্রয়ের সম্পাদক নির্মলকুমার ঘোষ।

৩. কলকাতার কেন্দ্রীয় রেলওয়ে স্টেশন।

৪. র‍্যালফ ফক্স ১৯০০ খ্রীস্টাব্দে ইংল্যাণ্ডে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ব্রিটেনের কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম সদস্য ছিলেন। ১৯৩৭ সালের জানুয়ারি মাসে স্পেনের রণাঙ্গনে ফ্যাসিস্টশক্তির বিরুদ্ধে অস্ত্র হাতে লড়তে লড়তে তিনি শহীদ হন। ইন্টার-ন্যাশনাল ব্রিগেডের ইঙ্গ-আইরিশ শাখার রাজনৈতিক কমিশনার হিসেবে স্পেনের কর্ডোভা অঞ্চলে লোপেরা নামের এক গ্রামে যুদ্ধরত অবস্থায় জার্মান বোমারু বিমানের আক্রমণে তিনি নিহত হন। ফক্সের সর্বাধিক পরিচিত গ্রন্থ 'দ্য নভেল এ্যাণ্ড দ্য পিপ্‌ল'। এটি তাঁর মৃত্যুর পর ১৯৩৭ সালে প্রকাশিত হয়। 'কমিউনিজম্ ফাইট্ অন কালচারাল ফ্রন্ট' তাঁর একটি উল্লেখ-যোগ্য প্রবন্ধ।

৫. ভারতের অন্যতম স্বাধীনতা-সংগ্রামী, 'অগ্নিযুগের কথা' (১৩৭৮ বঙ্গাব্দ) গ্রন্থের লেখক সতীশ পাকড়াশী (১৮৯৬-১৯৭৩)। তিনি মাত্র ১২ বছর বয়সে ঢাকা অনুশীলন সমিতিতে যোগ দেন। পরবর্তীতে সন্ত্রাসবাদী পথ পরিহার করে তিনি ভারতের কমিউ-নিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। ঢাকায় কমিউনিস্ট পার্টির সংগঠন-সৃষ্টিতে তিনি পালন করেন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। তাঁর স্মৃতি-কথামূলক গ্রন্থ 'অগ্নিযুগের কথা'য় আছে তাঁর গৌরবোজ্জ্বল জীবনের রোমাঞ্চকর সব অভিজ্ঞতার বর্ণনা। সোমেন চন্দকে কমিউনিস্ট পার্টিতে নিয়ে আসার ব্যাপারে সতীশ পাকড়াশীই প্রধান ভূমিকা পালন করেন।

৬. এই নাটকটির (নির্মলকুমার ঘোষের মতে এটি ছিল একাঙ্কিকা) নাম জানা যায়নি। আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশের জন্য মনো-নীত হয়েও তা অজ্ঞাতকারণে আর প্রকাশিত হয়নি।

৭. ঢাকায় প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা রণেশ দাশগুপ্ত-কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত-অচ্যুত গোস্বামী-সোমেন চন্দ-অমৃতকুমার দত্ত প্রমুখ আড্‌ডায় মিলিত হতেন। এই আড্‌ডায় সোমেন চন্দ মাঝে মাঝে তির্যক মন্তব্য করে অমৃতকুমারকে উত্তেজিত করতেন। একসময় উত্তেজিত হয়ে স্বচ্ছল ঘরের সন্তান অমৃতকুমার সকলকে নিয়ে হোটেলে ঢুকে খাবার অর্ডার দিতেন—ভেঙ্গে যেত মান-অভিমান।

—দ্রষ্টব্য : রচনাসংগ্রহ-১, পৃ. ২৮৬

৮. এ-সময় অচ্যুত গোস্বামী চর্মরোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। সোমেন চন্দই সেবা-শুশ্রূষা করে তাঁকে ভালো করে তোলেন।
—দ্রষ্টব্য : রচনাসংগ্রহ-১, পৃ. ২৭৬—৭৭

পত্রসংখ্যা : সাত

১. ঢাকার প্রগতি লেখক সংঘের মুখপত্র 'ক্রান্তি' (১৯৪০)।

২. বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের অন্যতম সৈনিক কাজী আবদুল ওদুদ (১৮৯৪-১৯৭০)। তিনি ছিলেন ঢাকা মুসলিম সাহিত্য-সমাজের (১৯২৬) এবং 'শিখা' (১৯২৭) পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম। সমালোচক হিসেবেই তিনি সমধিক পরিচিত। তাঁর উল্লেখযোগ্য সমালোচনা-গ্রন্থ হচ্ছে—কবিগুরু গ্যেটে (১৯৪৬), শাশ্বত-বঙ্গ (১৯৫১), কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ (১ম খণ্ড-১৯৫৫; ২য় খণ্ড-১৯৬৯) ইত্যাদি। কথাসাহিত্যিক হিসেবেও তাঁর পরিচিতি রয়েছে। এ-পর্যায়ে তাঁর রচনা 'মীর পরিবার' (১৯১৮) গল্পগ্রন্থ এবং 'নদীবক্ষে' (১৯১৮) ও 'আজাদ' (১৯৩০) উপন্যাস।

৩. কবি-ঔপন্যাসিক-সমালোচক-অধ্যাপক বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪)। 'প্রগতি' (১৯২৭) এবং 'কবিতা' (১৯৩৫) পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে আধুনিক কাব্যান্দোলনে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি ভারতের কলকাতাস্থ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন। ঢাকায় প্রগতি লেখক সংঘের অনুষ্ঠানে তিনি একাধিকবার যোগ দেন সভাপতি বা প্রধান বক্তা হিসেবে। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ—কাব্য : দময়ন্তী (১৯৪৩), দ্রৌপদীর শাড়ি ও অন্যান্য কবিতা (১৯৫৩), শীতের প্রার্থনা : বসন্তের উত্তর (১৯৫৫), যে-আঁধার আলোর অধিক (১৯৫৮), স্বাগত বিদায় (১৯৭১); উপন্যাস : তিথিডোর (১৯৪৯), মৌলিনাথ (১৯৫২), নীলাঞ্জনের খাতা (১৯৫৬); কাব্য-নাটক : তপস্বী ও তরঙ্গিনী (১৯৬৩) ; অনুবাদ : মেঘদূত (১৯৫৭); গদ্যরচনা : কালের পুতুল (১৯৪৬), রবীন্দ্রনাথ : কথাসাহিত্য (১৯৫৫), সঙ্গ-নিঃসঙ্গতা ও রবীন্দ্রনাথ (১৯৬৩) ইত্যাদি।

৪. মার্কসবাদী কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় (জ. ১৯১৯–)। তিরিশোত্তর কাব্যধারায় তিনি এক স্বতন্ত্র প্রতিভা। গণমানুষের সংগ্রামী-চেতনার চিত্রকল্পময় উপস্থাপনা তাঁর কবিতাকে বিশিষ্ট করে তুলেছে। তিনি ঢাকায় একাধিকবার এসেছিলেন প্রগতি লেখক সংঘের আহ্বানে। তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্য—পদাতিক (১৩৪৬), অগ্নিকোণ (১৩৫৫), চিরকুট (১৩৫৭), ফুল ফুটুক (১৩৬৪), যত দূরে যাই (১৩৬৯), কাল মধুমাস (১৩৭৩) ইত্যাদি।

৫. ক্রিস্টোফার কডওয়েল, যার আসল নাম ক্রিস্টোফার সেন্ট স্প্রিগ। ১৯০৭ খ্রীস্টাব্দের ২০শে অক্টোবর তিনি ইংলণ্ডের পাটনা শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৩৫ খ্রীস্টাব্দে ব্রিটেনের কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ লাভ করেন। স্পেনের গৃহযুদ্ধে ফ্রাঙ্কোর ফ্যাসিস্ট-বাহিনীর বিরুদ্ধে পপুলার ফ্রন্টে তিনি যোগ দেন ১৯৩৬ সালের ১১ই ডিসেম্বর। ১৯৩৭ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারি স্পেনের জারামা নদীর তীরে ফ্রাঙ্কো-বাহিনীর সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধে লড়াই করতে করতে তিনি শহীদ হন। কডওয়েলের মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয় তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'ইউলিশ্যন এ্যাণ্ড রিঅ্যালিটি' (১৯৩৭)। তাঁর আরো তিনটি বিখ্যাত গ্রন্থ হচ্ছে 'স্টাডিজ ইন এ ডায়িং কালচার' (১৯৩৮), 'ক্রাইসিস ইন ফিজিক্স' (১৯৩৯) এবং 'ফারদার স্টাডিজ ইন এ ডায়িং কালচার' (১৯৪৯)।

৬. 'অমৃতস্য পুত্রাঃ' (১৯৩৮) থেকেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে মার্কসবাদী চিন্তার প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। এ-সময় তিনি রাজনীতির সঙ্গে সরাসরি জড়িত ছিলেন না। ১৯৪০-এর পর থেকেই তিনি রাজনীতির সঙ্গে সরাসরি সংশ্লিষ্ট হন এবং ১৯৪৪ সালে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ লাভ করেন।

৭. ঔপন্যাসিক-ছোটগাল্পিক-কবি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়।

৮. সোভিয়েত ইউনিয়নের বিখ্যাত ঔপন্যাসিক ম্যাক্সিম গোর্কি (১৮৬৮-১৯৩৬)। ১৯০৫ এবং ১৯১৭ খ্রীস্টাব্দে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিপ্লব-সংগঠনে তিনি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন

করেন। 'মাকার চুদ্রা' (১৮৯২) নামক গল্প লিখে সাহিত্যিক হিসেবে প্রথম ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেন। *The Mother* (১৯০৭) উপন্যাসের লেখক হিসেবে তিনি সারা বিশ্বে পরিচিত। তাঁর অন্যান্য গ্রন্থ হচ্ছে--*Twenty-Six Man and a Girl* (১৮৯৯), *Foma Gordeer* (১৮৯৯), *Childhood*, (১৯১৩-১৪), *In the World* (১৯১৫-১৬) এবং *My Universities* (১৯২৩)। গোর্কির 'মা' উপন্যাস ছিল সোমেনের অতি প্রিয় গ্রন্থ। তাঁর একাধিক ছোটগল্পে 'মা' উপন্যাসের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।